Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যে কারনে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহনযোগ্য নয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইনাত সুলতানা

রোলঃ 216022317

৩ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যে কারনে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহনযোগ্য নয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইনাত সুলতানা
রোলঃ 216022317

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **“যে কারনে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহনযোগ্য নয়”** বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইনাত সুলতানা, আইডিঃ ২১৬০২২৩১৭ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "**যে কারনে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহনযোগ্য নয়**" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের **মাওলান মামুনুর রশীদ** উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ইনাত সুলতানা

(স্বাক্ষর)

ইনাত সুলতানা

আইডিঃ 216022317

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩ জুন, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা

সৃষ্টিজগতের মানুষের রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস। উইকিপিডিয়া তথ্য মতে বর্তমানে পৃথিবীতে সর্বমোট ধর্ম প্রচলিত আছে ১০,০০০ এর অধিক। কিন্তু একমাত্র হক ইলাহ

আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালার মনোনিত ধর্ম হলো ইসলাম। ইসলাম ব্যতিত ভিন্ন কোনো পন্থায় ভিন্ন কোনো বিশ্বাস আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য নয়।এই নিয়ে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন " **নিশ্চয় আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম"। (সূরা আলে ইমরান -১৯)**

ধর্ম কি?

গ্রহনযোগ্যতার দিক দিয়ে ইসলাম ধর্মই কেন একমাত্র অনন্য তা সম্পর্কে ধারনা পেতে হলে প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে ধর্ম কি?

ধর্মের সংজ্ঞা ব্যাপক,বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিভিন্ন শ্রেনির মানুষের কাছে এর সংজ্ঞার ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সেই সুবাধে ধর্মের একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞার ব্যাপারে কেউই একমত পোষন করতে পারিনি। তবে এতটুকু বলা যায় ইহজগতে যারাই সৃষ্টিকর্তার ধারনায় বিশ্বাসী হয়েছে তারা নিজে কিংবা কারো মাধ্যমে প্রবাবিত হয়ে বিভিন্ন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস লালন করেছে।আর এই বিভিন্ন বিশ্বাসের একত্রিত মেলবন্ধনই ধর্ম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

এই ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ বলেন -

[২:২৫৬] আল বাকারা

لا إِكراهَ فِي الدّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ فَمَن يَكفُر بِالطّاغوتِ وَيُؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استَمسَكَ بِالعُروَةِ الوُثقى لَا انفِصامَ لَها وَاللَّهُ سَميعٌ عَليم

দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

ধর্মের ইতিহাস

ধর্মের ইতিহাস বলতে বুঝায় মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি এবং ধারনাগুলোর লিখিতরূপ, যা বর্তমানে সংরক্ষিত রয়েছে। ধর্মীয় ধারনাগুলোর প্রাচীনতম প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েক হাজার বছর আগে মধ্য ও নিম্ন প্যালিলিথিক যুগে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রায় ৩০০,০০০ বছর আগে ধর্মীয় ধারনার প্রমাণ হিসাবে হোমো স্যাপিয়েনদের কবরস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। ধর্মীয় ধারনার অন্যান্য প্রমাণ আফ্রিকায় পাওয়া যায়, যার মধ্যে মধ্য পাথর যুগে হস্তনির্মিত বিভিন্ন প্রতীকী অন্তর্ভুক্ত। যাইহোক, প্রাথমিক প্যালিলিথিক যুগের হস্তনির্মিত বিভিন্ন প্রতীকীর ব্যাখ্যা, যা কীভাবে ধর্মীয় ধারণা সম্পর্কিত, তা নিয়ে বিতর্ক

রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ কিছুটা কম বিতর্কিত। বিজ্ঞানীরা সাধারণত ধর্মীয় ধারনার প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে উর্ধ-প্যালোলিথিক (৫০,০০০-১৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) যুগ থেকে পাওয়া বেশ কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয় ব্যাখ্যা করে থাকেন। সেই যুগের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর সাথে সম্পর্কিত উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে সিংহের মত দেখতে মানুষ, শুক্রের মূর্তি, চাউট গুহার সমাধি, গুহা চিত্র ইত্যাদি।

উনিশ শতকের গবেষকগণ ধর্মের উৎস সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন, যেটি খ্রিস্টান মতবাদকে বিতর্কিত করেছিলো। উদারতার আগে দাবিগুলো চ্যালেঞ্জ করেছিল। প্রারম্ভিক তত্ত্ববিদ এডওয়ার্ড বার্নেট টাইলর (১৮৩২-১৯১৭)

এবং হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩) অ্যানিমিজমের ধারণা প্রস্তাব করেছিলেন। আর প্রত্নতত্ত্ববিদ জন লুবক (১৮৩৪-১৯১৩) শব্দটিকে "প্রতিমাবাদ" বলেন। এদিকে ধর্মীয় পণ্ডিত ম্যাক মুলার (১৮২৩-১৯০০) বলেন ধর্ম শুরু হয় হেডোনিজম থেকে। ফোকলোরিস্ট উইলহেলম মানহার্ড (১৯৩১-১৮৮০) বলেছিলেন, ধর্ম "প্রাকৃতিকতা" থেকে শুরু হয়েছিল, যার দ্বারা তিনি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর পৌরাণিক ব্যাখ্যা বোঝাতে চেয়েছিলেন। এই সব তত্ত্বগুলো ব্যাপকভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত কোন বিস্তৃত ঐক্যমত্য নেই।
ধর্মের ইতিহাস বিভিন্ন ধর্মমতে ভিন্ন ভিন্ন, তবে বর্তমান পৃথিবীর প্রধান চারটি ধর্ম অর্থাৎ হিন্দু, খ্রিস্টান, ইসলাম ও ইহুদি।

ইসলাম ধর্মমতে পৃথিবীর সকল মানুষ একজন পিতা ও একজন মাতা থেকে জন্ম গ্রহন করেছেন। এই দুইজন আদি পিতা আদম (আ.) ও মাতা হাওয়া (আ.) এর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মানুষ এর জন্ম। এই চার ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ যথাক্রমে বেত, বাইবেল (নিউ টেস্টামেন্ট), কুরআন মাজিদ ও তাওরাহ (ওল্ড টেস্টামেন্ট) থেকে এই ঘটনার সূত্র পাওয়া যায়। মানবজাতির সৃষ্টির পর থেকেই মূলত মানুষের ধর্মের সূত্রপাত। ইসলাম ধর্মমতে আদম (আলাইহিস সালাম) পৃথিবীতে আগমনের পর তার প্রথমিক কাজ ছিল কিভাবে পৃথিবীতে জীবন ধারণ করতে হবে তা প্রতিপালন করা এবং এক্ষেত্রে ফেরেশতা জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) আদম (আলাইহিস সালাম) কে সহযোগিতা করেছেন। কিভাবে ঘর নির্মাণ করতে হবে, বেঁচে থাকার জন্য খাবার তৈরী করতে করা ও শিকার কিভাবে করতে হবে এসকল জিনিস ছিল তার প্রাথমিক কাজ

। পরবর্তিতে আদম (আলাইহিস সালাম) ও হাওয়া (আলাইহিস সালাম) এর সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করলে তখনো তাদের জীবনধারণ করাটাই ছিল তাদের ধর্মের মূল বিধিবিদান।

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ইতিহাস

ইসলাম ধর্ম :

ইসলামের প্রাথমিক যুগ (৬৩২–৭৫০)ঃ-

মুহাম্মাদের প্রথম উত্তরাধিকারী, যাদের খলিফা বলা হয় - আবু বকর, উমর, উসমান ইবনে আফফান, আলী ইবনে আবু তালিব এবং কখনও কখনও হাসান ইবনে আলী - সুন্নি ইসলামে তাঁরা আল-খুলাফা আল-রাশিদুন ("খুলাফায়ে রাশেদীন") হিসাবে পরিচিত। মুহাম্মাদ এর মৃত্যুর পর আবু বকর, ওমর, উসমান এবং আলী ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আবু বকর ছিলেন মুহাম্মাদ এর একজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী এবং তাঁর মৃত্যুর পর তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। ওমর ছিলেন আবু বকর এর পরবর্তী খলিফা। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। উসমান ছিলেন তৃতীয় খলিফা। তিনি একজন ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী করেছিলেন। আলী ছিলেন মুহাম্মাদ এর চাচাতো ভাই এবং তাঁর জামাই। তিনি চতুর্থ এবং শেষ খলিফা ছিলেন। আলী এর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে হাসান খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। কিন্তু হাসান কিছুদিন পরই মুয়াবিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। মুয়াবিয়া ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম উমাইয়া খলিফা ছিলেন। সুন্নি মুসলিমরা আবু বকর, ওমর, উসমান এবং আলীকে খোলাফায়ে রাশেদীন হিসেবে বিবেচনা করেন। এদের মধ্যে আলীকে তাঁর নৈতিকতা এবং ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য বিশেষভাবে সম্মান করা হয়। অন্যদিকে, শিয়া মুসলমানরা

শুধুমাত্র আলী এবং তাঁর বংশধরদেরকেই খলিফা হিসেবে বিবেচনা করে। তারা আবু বকর, ওমর এবং উসমানকে খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। ইবাদি মুসলিমরা শুধুমাত্র আবু বকর এবং ওমরকে খলিফা হিসেবে বিবেচনা করে। তারা আলী এবং উসমানকে খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। আবু বকর-এর নেতৃত্বে কুরআন সংকলনের কাজ শুরু হয়েছিল। খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ-এর সময় সাত ফকীহের কমিটি গঠিত হয় এবং সেই ফকীহদের মতামতকে সমন্বয় করে মালিক ইবনে আনাস ইসলামী আইনশাস্ত্রের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ মুওয়াত্তা রচনা করেন। খারিজিরা বিশ্বাস করত যে ভালো ও মন্দের মধ্যে কোনো আপোসযোগ্য মধ্যবর্তী অবস্থান নেই এবং যেকোনো মুসলিম গুরুতর পাপ করলে সে অবিশ্বাসী হয়ে যায়। তবে মুরজিয়ারা শিক্ষা দিয়েছিল যে মানুষের ন্যায়পরায়ণতা শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বারা বিচার করা সম্ভব। অতএব, অপরাধীরা ভুল পথে পরিচালিত বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু তাদের অবিশ্বাসী বলে নিন্দা করা উচিত নয়। এই মনোভাবটি মূলধারার ইসলামী বিশ্বাসে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

কিছু উপজাতি ইসলাম ছেড়ে দেয় এবং কিছু লোক নতুন নবী হিসাবে নিজেদের ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে নেতাদের অধীনে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে কিন্তু আবু বকর তাদের রিদ্দা যুদ্ধে পরাজিত করেন। ইহুদি এবং আদিবাসী খ্রিস্টানদের স্থানীয় জনগোষ্ঠী জিজিয়া কর প্রদান করত এবং মুসলিমরা দ্রুতই নতুন নতুন এলাকা জয় করতে থাকে, যার ফলে পারস্য এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে খিলাফতের দ্রুত প্রসার ঘটে।৬৪৪ সালে উসমানের হত্যার পর, আলী মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। তবে, উসমানের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাওয়া আয়িশা, মুয়াবিয়া এবং অন্যান্যরা আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ৬৫৬ সালে উটের যুদ্ধে আয়িশার সেনাবাহিনী আলীর কাছে পরাজিত হয়। ৬৫৭ সালে সিফফিনের যুদ্ধে আলী এবং মুয়াবিয়ার বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নেয়। যুদ্ধ সমাপ্তির জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেওয়া হয়। আলী এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেও মুয়াবিয়া তা প্রত্যাখ্যান করে। ৬৬১ সালে

নাহরওয়ানের যুদ্ধে আলী এবং মুয়াবিয়ার বাহিনী আবারও মুখোমুখি অবস্থান নেয়। যুদ্ধে আলী পরাজিত হন এবং মুয়াবিয়াকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে উমাইয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। উমাইয়ারা একটি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং খিলাফতকে একটি সামরিক শক্তিতে পরিণত করে। তারা পারস্য, মিশর এবং উত্তর আফ্রিকা সহ বিস্তৃত অঞ্চল জয় করে। ৬৮০ সালে কারবালার যুদ্ধে আলী এবং ফাতিমার (মুহাম্মাদের কন্যা) পুত্র হোসেন ইবনে আলীকে মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদের বাহিনী হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয়।

স্পেনের কর্ডোবা শহরে অবস্থিত কুরতুবা মসজিদটি কর্দোবা খিলাফতের সময় নির্মিত হয়েছিল, যা উমাইয়া খিলাফতের একটি শাখা ছিল।

উমাইয়া রাজবংশ উত্তর আফ্রিকা, ইবেরীয় উপদ্বীপ, নারবোনীয় গল এবং সিন্ধু জয় করে। উমাইয়াদের বৈধতার অভাব ছিল এবং তারা ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষিত সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভরশীল ছিল। যেহেতু জিজিয়া কর ছিল অমুসলিমদের দ্বারা প্রদত্ত একটি কর এবং এই করের উপরই সামরিক বাহিনীর অর্থায়ন নির্ভর করত, তাই উমাইয়ার প্রশাসকগন অনারবদের ধর্মপরিবর্তন অনুৎসাহিত করত, কারণ তারা মনে করত যে এই ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া তাদের রাজস্ব কমিয়ে দিতে পারে। যেখানে রাশিদুন খিলাফতে কঠোরতার প্রতি জোর দেয়া হয়েছিল, এমনকি উমর প্রতিটি কর্মকর্তার সম্পদের বিস্তারিত তালিকা চেয়েছিলেন, সেখানে উমাইয়া রাজবংশের এই বিলাসিতা ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দেয়। ফলে খারেজীরা বার্বার বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়, যা খিলাফতকে প্রথম স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দিকে নিয়ে যায়। আব্বাসীয় বিপ্লবে, অনারব ধর্মপরিবর্তনকারীরা (মাওলা), উমাইয়া গোত্রের দ্বারা সরিয়ে দেওয়া আরব গোত্রগুলো এবং কিছু শিয়া একসঙ্গে একত্রিত হয়ে উমাইয়াদের উৎখাত করে এবং ৭৫০ সালে আব্বাসীয় রাজবংশের সূচনা হয়। আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের পরাজিত করে খিলাফতকে ইরাকের বাগদাদে স্থানান্তরিত করে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগ ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামরিক বিজয় এবং ধর্মীয় বিভাজনের একটি সময়। এই যুগের ঘটনাগুলো ইসলামের বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের শেষে, ইসলাম একটি শক্তিশালী ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠে। খিলাফত উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করে যা এই অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার ইসলামী সংস্কৃতি, আইন এবং শিক্ষার বিকাশকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।

- **ইসলামের স্বর্ণযুগ (৭৫০-১২৫৮)ঃ-**

আব্বাসীয়রা ছিলেন মুহাম্মাদ এর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। তারা উমাইয়াদের আরব-কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। ৭৫০ সালে আব্বাসীয়রা কুফায় একটি বিপ্লব ঘোষণা করে। এই বিপ্লবে উমাইয়া খলিফা মালিক ইবনে আনাসের পরাজিত হয় এবং আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসে। আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের কাছ থেকে ইবেরীয় উপদ্বীপ ব্যতীত সমস্ত ভূখণ্ড দখল করে নেয়। ইবেরীয় উপদ্বীপের অংশ তখন উমাইয়াদের অধীনে একটি স্বাধীন খিলাফত হিসেবে পরিচিত ছিল, যাকে আন্দালুসীয় খিলাফত বলা হয়। আব্বাসীয়দের ৭৫০ সালে উমাইয়া খিলাফতকে উৎখাত করে ক্ষমতায় আসার ফলে মুসলিম বিশ্বে নতুন এক যুগের সূচনা হয়, যা আব্বাসীয় যুগ নামে পরিচিত। আব্বাসীয় খিলাফত ৭৫০ সাল থেকে ১২৫৮ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ ৫০৮ বছর স্থায়ী ছিল। এই সময়ের মধ্যে আব্বাসীয়রা মুসলিম বিশ্বের একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। তবে ১২৫৮ সালে মঙ্গোলদের বাগদাদ আক্রমণের ফলে আব্বাসীয় খিলাফত ভেঙে পড়ে। আব্বাসীয় যুগে আব্বাসীয়রা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আব্বাসীয় যুগ ছিল ইসলামের জন্য এক স্বর্ণযুগ। আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসার পর খিলাফতের রাজধানী পরিবর্তন করা হয়। দামেস্ক থেকে রাজধানী সরিয়ে আনা হয় বাগদাদে।

আব্বাসীয় খিলাফতের সময়, ৮ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাগদাদে বাইতুল হিকমত নামে একটি বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রটি বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির পণ্ডিতদের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন করেছিলেন। এই সময়টিকে ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হয় কারণ এই সময়ে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক ও শিল্পকলা বিষয়ে মুসলিমরা ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। আল-কিন্দি, আল ফারাবী, আল খারেজমি, ইবনে সিনা, হাসান ইবনুল হায়সাম, আল বিরুনি, ইবনে রুশদ, আল-জাজারি, আল-গাজ্জালি, ইবনে বতুতা, ইবনে খালদুন, উলুঘ বেগ এবং আরও অনেক বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত এই সময়ে অবদান রেখেছিলেন। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও উন্নয়ন করেছিলেন। তাদের কাজ মধ্যযুগীয় ইউরোপকে প্রভাবিত করেছিল।

ইসলামের স্বর্ণযুগে, ভারত থেকে আন্দালুস পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা হতো। এছাড়াও ঔষধ, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ইসলামি আইন ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রেও গবেষণা করা হতো। এই সময়কালে, মুসলিম পণ্ডিতরা গ্রিক, লাতিন এবং অন্যান্য প্রাচীন ভাষাগুলো অনুবাদ করেন, যার ফলে এই সভ্যতাগুলোর জ্ঞান এবং চিন্তাভাবনাগুলো আরব এবং পারস্য বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এই অনুবাদগুলো ইউরোপেও প্রভাব ফেলেছিল এবং রেনেসাঁর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। চীনাদের সাথে যুদ্ধ এবং অন্যান্য সম্পর্কগুলোর সময় আরবরা কাগজের উৎপাদন কৌশল শিখেছিল। কাগজের ব্যবহারের ফলে পাণ্ডুলিপিগুলো আরও সহজে ছড়িয়ে পড়ে। আরবরা ভারত থেকে শূন্য এবং দশমিক পদ্ধতির আবিষ্কার গ্রহণ করেছিল। এর ফলে গণিতের প্রতি আগ্রহ ও চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ মানুষও পাটিগণিত বুঝতে ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। গণিত ও পাটিগণিতের পাশাপাশি ত্রিকোণমিতিও বিকাশ লাভ করে। এই সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে পর্যবেক্ষণালয় নির্মিত হয় এবং আলোকবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানও বিকশিত হতে থাকে।

হুনাই ইবনে ইসহাকের চোখের উপরের কাজটি আধুনিক দৃষ্টিবিজ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করেছিল।

আল-শাফেয়ী হাদীসের সনদের সত্যতা নির্ধারণের একটি পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। প্রাথমিক আব্বাসীয় যুগে, মুহাম্মদ আল-বুখারী এবং মুসলিম ইবনে আল-হাজ্জাজের মতো পণ্ডিতগণ সুন্নি হাদীসের প্রধান সংকলনগুলোকে সংকলিত করেন, অন্যদিকে আল-কুলায়নী এবং ইবন বাবুয়াহের মতো পণ্ডিতগণ শিয়া হাদীসের প্রধান সংকলনগুলো সংকলিত করেন। চারটি সুন্নি মাজহাব, হানাফি, হাম্বলি, মালিকি ও শাফিঈ, যথাক্রমে আবু হানিফা, আহমদ ইবনে হাম্বল, মালিক ইবনে আনাস এবং আল-শাফেয়ীদের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপরীতে, জাফর আস-সাদিকের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে জাফরি আইনশাস্ত্র গঠিত হয়। নবম শতাব্দীতে, আল-তাবারী কুরআনের প্রথম তাফসীর (অর্থ ও বর্ণনা) তাফসীর আল-তাবারী সম্পন্ন করেন, যা সুন্নি ইসলামে সর্বাধিক উদ্ধৃত তাফসীরগুলোর মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠে। হাসান আল-বসরির মতো তপস্বীরা একটি আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে যা তাসাউফ বা সুফিবাদে পরিণত হয়।

এই সময়ে, ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যাগুলো, বিশেষত মুক্ত ইচ্ছার বিষয়ে, বিশিষ্টভাবে আলোচনা করা হয়। হাসান আল-বসরি মনে করতেন, যদিও আল্লাহ মানুষের কর্ম সম্পর্কে জানেন, কিন্তু ভালো এবং মন্দ কাজের আকাঙ্ক্ষা আসে মুক্ত ইচ্ছার অপব্যবহার এবং শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে। গ্রীক যুক্তিবাদী দর্শন মু'তাজিলা নামে পরিচিত এক ধরনের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল, যারা বিখ্যাত ওয়াসিল ইবনে আতার উদ্ভাবিত মুক্ত ইচ্ছার ধারণাকে সমর্থন করেছিল।[২৫৫] আল-ফারাবি, ইবনে সিনা এবং ইবনে রুশদ এর মত দার্শনিকরা ইসলামের শিক্ষার সাথে অ্যারিস্টটলের ধারণাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করেন, যা ইউরোপের খ্রিস্টান ধর্মের স্কোলাসিজম এবং ইহুদি ধর্মের মুসা

বিন মৈমুনের কাজের অনুরূপ, অন্যদিকে আল-গাজালির মত অন্যরা এ ধরনের সমন্বয়বাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখান এবং অবশেষে জয়লাভ করেন।

ইসলামের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত এই সময়ে, ইসলামী বিজ্ঞানে বিশাল অগ্রগতি সাধিত হয়। ঔষধ, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কৃষি, পদার্থবিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রকৌশল এবং দৃষ্টিবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।আবূ আলী ইবনে সিনা (অ্যাভিসেনা) পরীক্ষামূলক ঔষধের একজন অগ্রগামী ছিলেন এবং তার রচিত 'ক্যানন অফ মেডিসিন' শতাব্দী ধরে ইসলামী বিশ্ব এবং ইউরোপে ঔষধের একটি প্রামাণিক পাঠ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর-রাজি (রাযেস) চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রথম হাম এবং গুটিবসন্ত রোগকে আলাদাভাবে শনাক্ত করেন। সেই সময়ের সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রথম চিকিৎসকদের লাইসেন্স (অনুমতি) প্রদানের জন্য মেডিকেল ডিপ্লোমা প্রদান করা হতো। হাসান ইবনুল হায়সামকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জনক এবং প্রায়শই "বিশ্বের প্রথম প্রকৃত বিজ্ঞানী" হিসেবে অভিহিত করা হয়।প্রকৌশলে, বানু মুসা ভাইদের নির্মিত স্বয়ংক্রিয় বাঁশি বাজানো যন্ত্রটিকে প্রথম প্রোগ্রামযোগ্য যন্ত্র বলে মনে করা হয়। গণিতে, আলগোরিদম শব্দটির উৎপত্তি মুহাম্মদ ইবনে মূসা আল-খারিজমির নাম থেকে, যিনি বীজগণিতের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত।তখনকার সময়ে সরকার বিজ্ঞানীদের বেতন আজকের পেশাদার ক্রীড়াবিদদের বেতনের সমান প্রদান করত। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস ৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আল কারাওইন বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের প্রাচীনতম ডিগ্রি-প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। খ্রিস্টান, ইহুদি এবং সাবিয়ানদের মতো অনেক অমুসলিমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী সভ্যতায় অবদান রেখেছেন। বাইতুল হিকমাহ (হাউস অফ উইজডম) নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানে গ্রিক ও অন্যান্য সভ্যতার বইয়ের আরবি অনুবাদ এবং নতুন জ্ঞান উন্নয়নের জন্য খ্রিস্টান ও পার্সিয়ান পণ্ডিতদের নিয়োগ করা হয়েছিল।

আব্বাসীয় খিলাফত থেকে সৈন্যরা বিদ্রোহ করে ৮৬৮ সালে মিশরে তুলুনি রাজবংশ এবং ৯৭৭ সালে মধ্য এশিয়ায় গজনভি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। এই বিভাজনের সময়েই ৯৪৫ থেকে ১০৫৫ সালের মধ্যে শিয়া সতাব্দী আসে, যা হাজারবছরবাদী ইসমাইলি শিয়া মিশনারি আন্দোলনের উত্থান ঘটায়। একটি ইসমাইলি গোষ্ঠী, ফাতেমীয় রাজবংশ, ১০ম শতাব্দীতে উত্তর আফ্রিকা দখল করে নেয় এবং আরেকটি ইসমাইলি গোষ্ঠী, কারামাতিয়ানরা, মক্কা আক্রমণ করে এবং কাবাঘরে স্থাপিত হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) চুরি করে নেয়। অন্য আরেকটি ইসমাইলি গোষ্ঠী, বুইদ রাজবংশ, বাগদাদ জয় করে এবং আব্বাসীয়দেরকে একটি নামমাত্র রাজতন্ত্রে পরিণত করে। সুন্নি সেলজুক রাজবংশ সময়ের ধর্মীয় পণ্ডিতদের মতামত প্রচার করে, বিশেষ করে নেজামিয়া নামে পরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে সুন্নি ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচারণা চালায়। এই নেজামিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-গাজ্জালী এবং শেখ সাদির সাথে সম্পর্কিত।

১২৫৮ সালে মঙ্গোলদের বাগদাদ আক্রমণ ও অবরোধ এবং আব্বাসীয় খিলাফতের পতন ইসলামী স্বর্ণযুগের সমাপ্তি ঘটায়। তবে কিছু কিছু সূত্র মতে এই সময় ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত, আবার কিছু সূত্র মতে ১৫শ শতাব্দী বা এমনকি ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

মুসলিম বিশ্বের বিস্তার ধর্মীয় মিশনের মাধ্যমে চলতে থাকে, যা ভলগা বুলগেরিয়াকে ইসলামে রূপান্তরিত করে। দিল্লি সুলতানাত ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং অনেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়, বিশেষ করে নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা, যাদের বংশধররা ভারতীয় মুসলিমদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা গঠন করে।বাণিজ্যিক সুবাধে অনেক আগেই মুসলিমরা চীনে পৌঁছে, যেখানে তারা সংগং রাজবংশের আমদানি-রপ্তানি শিল্পে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ইউয়ান রাজবংশে মুসলিমদেরকে শাসক সংখ্যালঘু শ্রেণী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল।

- **প্রাক-আধুনিক যুগ (১২৫৮-১৮শ শতক)ঃ-**

মঙ্গোল সাম্রাজ্যের সপ্তম ইলখানাতে শাসক গাজান খান ইসলাম গ্রহণ করেন।
অটোমান সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ বাইজেন্টাইনদের পরাজিত করে কনস্টান্টিনোপল বিজয় করেন।
মুসলিম ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার সুবাধে বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতেন এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার করতেন। সুফি তরিকার দরবেশরাও বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতেন এবং মানুষকে ইসলামের শিক্ষায় দীক্ষা দিতেন। এইভাবে, ইসলাম বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে ইসলাম দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধর্মান্তর প্রায়ই বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসের মধ্যে এক ধরনের সমন্বয়ের মাধ্যমে ঘটত। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু লোককাহিনীতে মুহাম্মাদের উপস্থিতি দেখায় যে ইসলামে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা কিভাবে তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের কিছু বিশ্বাস ধরে রেখেছিল। এছাড়াও, মুসলিম তুর্করা তাদের নিজস্ব তুর্কি টেংরিবাদের বিশ্বাসের উপাদানগুলোকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। মিং রাজবংশের সময়কার চীনে, মুসলিমরা যারা আগের অভিবাসীদের বংশধর ছিল তারা চীনা সমাজে আত্মীকৃত হয়ে গিয়েছিল। কখনও কখনও, এই আত্মীকরণ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জোর করে করা হয়েছিল, যেমন চীনা নাম গ্রহণ এবং চীনা সংস্কৃতি মেনে চলা। তবে অনেক মুসলিম চীনারাও তাদের ইসলামী বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছিল। নানজিং সেই সময় চীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র ছিল।

মঙ্গোলরা ১২৫৮ সালে বাগদাদ দখল করে এবং আব্বাসীয় খিলাফতকে ধ্বংস করে দেয়। আব্বাসীয় খিলাফত আরব সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল এবং এর পতনের ফলে

আরব সংস্কৃতির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে। ইরান ও মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত মুসলিম মঙ্গোল খানাতিরা ছিল মঙ্গোল সাম্রাজ্যের অংশ। মঙ্গোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খান ছিলেন একজন তুর্কি বংশোদ্ভূত মঙ্গোল নেতা। তিনি ১২শ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় মঙ্গোল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মঙ্গোল সাম্রাজ্য তার শাসনামলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য ছিল। এটি ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিশাল অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। ১৩শ শতাব্দীতে, মঙ্গোলরা ইরান ও মধ্য এশিয়ায় আক্রমণ করে এবং এই অঞ্চলগুলোকে তাদের সাম্রাজ্যের অংশ করে নেয়। মঙ্গোলরা এই অঞ্চলগুলোতে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। মঙ্গোল শাসনাধীনে, ইরান ও মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত মুসলিম খানাতিরা পূর্ব এশিয়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আন্তঃসংস্কৃতিক প্রবেশাধিকার থেকে উপকৃত হয়েছিল। পূর্ব এশিয়ায় তখন চীনা ও মঙ্গোল সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিল। এই দুটি সাম্রাজ্যের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদান ছিল। ইরান ও মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত মুসলিম খানাতিরা সংস্কৃতির এই আদান-প্রদান থেকে উপকৃত হয়েছিল।নাসিরুদ্দিন আল-তুসি ছিলেন এই সময়কার একজন বিশিষ্ট পারস্য-তুর্কি পণ্ডিত। তিনি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, ধর্ম ও চিকিৎসাবিদ্যায় অবদান রেখেছিলেন। তিনি তার গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় অবদানের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। নাসিরুদ্দিন আল-তুসির একটি গাণিতিক মডেল ছিল যা পরে নিকোলাস কোপার্নিকাস দ্বারা গৃহীত হয় বলে দাবি করা হয়। কোপার্নিকান সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের তত্ত্ব প্রণয়ন করেছিলেন । জমশিদ আল-কাশি ছিলেন নাসিরুদ্দিন আল-তুসির ছাত্র। তিনি পাইয়ের একটি অনুমান প্রস্তাব করেছিলেন যা ১৮০ বছর ধরে অপেক্ষাকৃত সঠিক ছিল। পাই হলো একটি গাণিতিক ধ্রুবক যা একটি বৃত্তের পরিধিকে তার ব্যাসের দ্বারা ভাগ করে নির্ধারণ করা হয়। পাইয়ের মান প্রায় ৩.১৪। জমশিদ আল-কাশির অনুমানটি ছিল ৩.১৪১৫৯২।

বারুদ অস্ত্রের উদ্ভব মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক কাঠামোতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছিল। বারুদ অস্ত্রগুলো তাদেরকে তাদের প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য সামরিক সুবিধা দিয়েছিল, যা তাদেরকে তাদের কর্তৃত্বের প্রসার ঘটাতে

সহায়তা করেছিল। এর ফলে, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল একত্রিত হয়ে বৃহৎ এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র গঠন করেছিল। এই নতুন রাষ্ট্রকে "বারুদ সাম্রাজ্য" বলা হয় কারণ তাদের শক্তির উৎস ছিল বারুদ অস্ত্র। অটোমান সাম্রাজ্য ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে হিজাজ অঞ্চল জয় করার পর, তারা নিজেদেরকে মুসলিম বিশ্বের নেতা হিসাবে ঘোষণা করেছিল।এই দাবিটিকে সমর্থন করার জন্য, তারা নিজেদেরকে খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেছিল, যা মুসলিম বিশ্বের নেতার একটি ধর্মীয় উপাধি। সাফাভি রাজবংশ ১৫০১ খ্রিষ্টাব্দে ইরানে ক্ষমতায় এসেছিল। তারা ছিল একটি শিয়া মুসলিম রাজবংশ এবং তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে মুসলিম বিশ্বে একটি নতুন ধরনের রাজনৈতিক বিভাজন তৈরি হয়েছিল। বাবর, একজন তুর্কি মুসলিম শাসক, ১৫২৬ সালে ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সাম্রাজ্যটি দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম শাসনের একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল।

ইসলামপূর্ব আরব উপদ্বীপ ছিল বহুদেববাদী। প্রতিটি গোত্র তাদের নিজস্ব দেবতা ও দেবীদের বিশ্বাস ও উপাসনা করত। এই দেবতা ও দেবীরা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতা সহ বিভিন্ন বিষয়ের সাথে যুক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপ,
ইসলামপূর্ব আরবদের বিশ্বাসানুযায়ী, লাত ছিল পাতালের দেবী, উজ্জা ছিল উর্বরতার দেবী এবং মানাত ছিল ভাগ্যের দেবী। এই দেবতা ও দেবীদের আত্মা গাছ, পাথর, জলাশয় এবং কুয়োগুলোর সাথে সম্পর্কিত ছিল। এই স্থানগুলোকে পবিত্র বলে মনে করা হত এবং সেখানে প্রায়ই তাদের উপাসনা করা হত। আরব

পুরাণে, মূর্তিগুলোকে দেবতা ও দেবীদের প্রতীক হিসাবে দেখা হত। এই মূর্তিগুলো প্রায়ই পাথর বা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হত। মূর্তিগুলোকে পূজা করা হত এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা হত। ইসলামপূর্ব আরব উপদ্বীপে উপসনার জন্য অনেকগুলো পবিত্র স্থান ছিল। এই স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে কাবা, যা মক্কায় অবস্থিত একটি পবিত্র ঘনআকৃতির কাঠামো। কাবাকে ইসলামের সবচেয়ে

পবিত্র স্থান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আরবরা নিষিদ্ধ মাসগুলোতে পবিত্র স্থানগুলো পরিদর্শন করত। এই মাসগুলোতে যুদ্ধ এবং সহিংসতা নিষিদ্ধ ছিল। পবিত্র স্থানগুলোতে পরিদর্শনকারীরা বিভিন্ন উপাসনা করত, যেমন প্রার্থনা, উপবাস এবং পশু জবাই।

ইরাকের হাতরা শহর থেকে আবিষ্কৃত এই খোদাইতে তিনজন কল্পিত আরব দেবীদের দেখানো হয়েছে: লাত, মানাত, এবং উজ্জা। ইসলামপূর্ব আরবদের বিশ্বাস অনুযায়ী, লাত মক্কার একটি প্রধান দেবী ছিল, মানাত উর্বরতার দেবী ছিল, এবং উজ্জা যুদ্ধের দেবী ছিল।

মক্কার কাবা প্রাচীনকালে বিভিন্ন আরব উপজাতিদের পৃষ্ঠপোষক দেবতাদের

১৬০টি মূর্তির আবাসস্থল ছিল। এই মূর্তিগুলো বিভিন্ন আকৃতি ও আকারের ছিল এবং সেগুলোকে বিভিন্ন নিয়মে পূজা করা হতো। কাবায় অবস্থিত তিনটি দেবী, মানাত, লাত এবং উজ্জাকে আল্লাহর কন্যা বলে মনে করা হতো। এই দেবীদেরকেও বিভিন্ন উপায়ে পূজা করা হতো। অন্যদিকে আরব সমাজে খ্রিস্টান, ইহুদিসহ বিভিন্ন একত্ববাদী সম্প্রদায়ও ছিল। এই সম্প্রদায়গুলো একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করত এবং মূর্তিপূজা করত না। স্থানীয় আরবদের মধ্যে হানিফরাও ছিল। হানিফরা একত্ববাদী ছিল এবং তারা একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করত।তবে তাদেরকে কখনও কখনও ভুল করে খ্রিস্টান বা ইহুদিদের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা হতো। মুসলিম বিশ্বাস অনুসারে, মুহাম্মাদও একজন

হানিফ ছিলেন এবং তিনি ইব্রাহিমের পুত্র ইসমাইলের বংশধর ছিলেন।

ইসলামী সাহিত্যে, ইসলামের আগের আরব সমাজের যুগকে "আইয়ামে জাহেলিয়া" বা "অজ্ঞতার যুগ" বলা হয়। এই শব্দটি কুরআন ও হাদীসে আরবদের ইসলামের আগের বিশ্বাস ও আচরণকে ইসলামী যুগ থেকে আলাদা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই যুগের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যভিচার, চুরি, মূর্তিপূজা, অবিচার এবং দাসত্বের

স্বাভাবিকতা। আইয়ামে জাহেলিয়ার সময় আরবরা ইসলামি শিক্ষার সাথে পরিচিত ছিল না। এই সময়ের মধ্যে, তারা প্রায়শই অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস এবং বর্বর আচরণে লিপ্ত ছিল। তারা প্রায়শই ব্যভিচার, চুরি, মূর্তি পূজা, অবিচার এবং দাসত্বে লিপ্ত হত।

ইসলামী ইতিহাসবিদদের মতে, জাহিলী যুগে নারীদের নিম্নশ্রেণির মানুষ হিসেবে দেখা হত। বহুবিবাহ খুবই সাধারণ বিষয় ছিল। পতিতাবৃত্তি একটি সাধারণ পেশা ছিল এবং দাস মালিকরা তাদের দাসীদের এই কাজে বাধ্য করত। নারীরা তাদের বাবা বা স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেত না। সন্তানরা চাইলে তাদের বাবার মৃত্যুর পরে তাদের সৎমায়ের সাথে বিবাহ করতে পারত। বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার শুধুমাত্র পুরুষের ছিল এবং তা ছিল সীমাহীন।অভিজাতরা কন্যা সন্তান হলে তাকে একটি লজ্জার উৎস হিসেবে দেখত এবং তাদের হত্যা করত। এই সময়ে মেয়েদের জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো জঘন্যতম কাজও করা হত। আরবরা অন্যান্য জাতি থেকে খুব বেশি
আলাদা ছিল না শিশু হত্যার ক্ষেত্রে, যা উৎসর্গ বা অন্যান্য কারণে করা হত।

ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে, মুহাম্মাদ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবনের প্রথম দিকেই পিতৃমাতৃহীন হন। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি বেড়ে ওঠেন এবং 'আমিন' (বিশ্বস্ত) নামে পরিচিত হন। পরে তিনি তার মনিব, ব্যবসায়ী খাদিজাকে বিয়ে করেন। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে, মক্কায় বিদ্যমান নৈতিক অবক্ষয় ও মূর্তিপূজা দ্বারা বিরক্ত হয়ে এবং নির্জনতা ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনার জন্য, মুহাম্মাদ মক্কার কাছে জাবালে নূর পর্বতের হেরা গুহায় আশ্রয় নেন। গুহায় থাকাকালীন সময়েই আল্লাহর নিকট হতে ফেরেশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে তাঁর উপর কুরআনের প্রথম আয়াত নাযিল হয়। মুহাম্মাদের গুহায় থাকাকালীন অবস্থায় যে রাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তাকে 'লায়লাতুল কদর' (শবে কদর) বলা হয় এবং এই ঘটনাটিকে ইসলামী ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচনা করা হয়। ৪০ বছর বয়স থেকে, জীবনের

পরবর্তী ২২ বছর ধরে, মুহাম্মাদের নিকট আল্লাহর কাছ থেকে আয়াত অবতীর্ণ হতে থাকে এবং তিনি মানবতার কাছে প্রেরিত সর্বশেষ নবী হয়ে ওঠেন।

মুহাম্মাদ প্রথম তিন বছর ধরে শুধুমাত্র তার পরিবার এবং আত্মীয়দের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। এই সময়ে, তিনি তাদেরকে ইসলামের মূল বিষয়গুলো শিখিয়েছিলেন, যেমন আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তি, এবং ইসলামের মূল পাঁচ স্তম্ভ।

মক্কায় থাকাকালীন সময়ে মুহাম্মাদ প্রথমে গোপনে ও তারপর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং তার শ্রোতাদের বহুঈশ্বরবাদ ত্যাগ করে এক আল্লাহর উপাসনা করার আহ্বান জানান। ইসলামের প্রথম দিকের অনেক গ্রহণকারী ছিল নারী, গরীব, বিদেশী এবং দাসেরা যেমন প্রথম মুয়াজ্জিন বিলাল ইবনে রাবাহ আল-হাবাশি। মক্কার অভিজাতরা মনে করতেন যে এক আল্লাহর প্রচার করার মাধ্যমে মুহাম্মাদ তাদের সামাজিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তুলছেন কারণ তারা কাবার মূর্তিগুলোর জন্য তীর্থ করতে আসা তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে মুনাফা অর্জন করতো। মুহাম্মাদ যখন আরও বেশি মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতে শুরু করলেন, তখন মক্কার অনেক গোত্র তার বিরুদ্ধে বিরূপ হয়ে ওঠে। তারা তাকে এবং তার অনুসারীদের উপর নির্যাতন চালায়। এই নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে শারীরিক আঘাত, সম্পত্তি ধ্বংস করা এবং সামাজিক বয়কট। মক্কার নির্যাতন থেকে বাঁচতে, মুহাম্মাদ ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে কিছু মুসলিমকে আবিসিনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। আবিসিনিয়া ছিল একটি খ্রিস্টান রাজ্য, কিন্তু তারা মুসলিমদেরকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য আশ্রয় দিয়েছিল।

মুসলিমদের উপর মক্কার অধিবাসীদের ১২ বছরের নির্যাতনের পর, ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদ এবং তার সাহাবীরা ইয়াসরিব (বর্তমান মদিনা) শহরে হিজরত (অভিবাসন) করেন। সেখানে, মদিনার গ্রহীতাদের (আনসার) এবং মক্কার প্রবাসীদের (মুহাজির) সঙ্গে মুহাম্মাদ মদিনায় তার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। মদিনার

সকল উপজাতি মদিনার সনদে স্বাক্ষর করে। এই সনদটি ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের নিজস্ব আইন ব্যবহারের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করে এবং সকল প্রকার বাহ্যিক হুমকি থেকে মদিনাকে রক্ষা করার জন্য সকল গোত্রের মাঝে একটি চুক্তি স্থাপন করে।

৬২২ সালে মদিনায় হিজরত করার পর, মুহাম্মাদ তাঁর অনুসারীদের সাথে মক্কার পৌত্তলিকদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মক্কার পৌত্তলিকরা তাদের সাথে
শান্তিপূর্ণভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজি হননি। তাই, মুহাম্মাদ মুসলিম বাহিনী গঠন করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধগুলোতে, মুসলিম বাহিনী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিজয় লাভ করে।

মক্কার বাহিনী ও তাদের মিত্ররা ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের কাছে পরাজিত হয় এবং তারপর উহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মদিনাকে অবরোধ করতে ব্যর্থ হয় (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭)। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে, মক্কা এবং মুসলিমদের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, কিন্তু দুই বছর পর মক্কার অধিবাসীরা এটিকে ভঙ্গ করে। আরও উপজাতি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ায়, মক্কার বাণিজ্যপথগুলো মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ৬৩০ সালে, মুহাম্মাদ একটি বড় মুসলিম বাহিনী গঠন করে মক্কায় অভিযান চালায়। এই অভিযানে, মুসলিম বাহিনী মক্কায় বিজয় অর্জন করে এবং কাবা থেকে সকল প্রকার মূর্তি অপসারণ করে। এই বিজয় আরব উপদ্বীপে ইসলামের বিস্তারকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল। ৬৩২ সালে, মুহাম্মাদ বিদায় হজ্জ সম্পন্ন করেন এবং আরাফাত পাহাড়ে প্রায় ১২৪,০০০ মুসলিমের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে তিনি মুসলিমদেরকে পরস্পরের সাথে ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং সহযোগিতার বন্ধন গড়ার আহ্বান জানান। উক্ত ভাষণের কয়েক মাস পরে, মদিনায় থাকাকালীন অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মুহাম্মাদ এর মৃত্যুর আগে, আরব উপদ্বীপের বৃহৎ অংশের ইসলাম গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে, আরব উপদ্বীপের মানুষরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলে। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সময় (৬২ বছর বয়সে) মুহাম্মাদ আরব উপদ্বীপের উপজাতিগুলোকে একটি একক ধর্মীয় রাষ্ট্রের অধীনে একত্রিত করেন।

মুহাম্মাদ ছিলেন একজন মহান ধর্মীয় নেতা এবং তিনি বিশ্বের সকল মানুষকে
ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সময়ে পৃথিবীর অনেক বৃহৎ রাষ্ট্রের শাসকদের কাছে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আল্লাহ কুরআনে বলেন :

[৫৯:৭] আল হাশ্‌র

ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسولِهِ مِن أَهلِ القُرى فَلِلَّهِوَلِلرَّسولِ وَلِذِي القُربى وَاليَتامى وَالمَساكينِ وَابنِ السَّبيلِ كَي لا يَكونَ دولَةً بَينَ الأَغنِياءِ مِنكُم وَما آتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِق

আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফায় হিসেবে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, আত্মীয়-স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও মুসাফিরদের এটি এ জন্য যে, যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে। রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

হিন্দু ধর্ম :

হিন্দুধর্ম ভারতীয় উপমহাদেশীয় ধর্ম বা জীবনধারা।এটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম, যার অনুসারী সংখ্যা ১২০ কোটিরও বেশি, বা বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার ১৫-১৬%, যারা হিন্দু নামে পরিচিত। হিন্দু শব্দটি একটি উচ্ছসিত,এবং হিন্দুধর্মকে বিশ্বের প্রাচীনতম জীবিত ধর্ম হিসেবে দেখা হয়। অনেক অনুশীলনকারীই তাদের ধর্মকে সনাতন ধর্ম বা চিরন্তন পন্থা হিসাবে উল্লেখ করেন, যেমনটি হিন্দু ধর্মগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে, যার দ্বারা এর উৎস মানব ইতিহাসের বাইরে, এমন ধারণা বুঝানো হয়। এ ধর্মের মূলে বেদ হওয়ায় এটি 'বৈদিক ধর্ম' নামেও পরিচিত।

হিন্দুধর্ম হল বিভিন্ন দর্শন এবং ভাগ করা ধারণা, আচার, বিশ্বতাত্ত্বিক ব্যবস্থা, তীর্থস্থান এবং ভাগ করা পাঠ্য উৎস দ্বারা চিহ্নিত একটি বৈচিত্র্যময় চিন্তাধারা যা ধর্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, পুরাণ, বৈদিক যজ্ঞ, যোগব্যায়াম, আগমিক আচার এবং মন্দির নির্মাণ নিয়ে আলোচনা করে। ধর্মীয় আচারগুলো মূলত ধর্ম (নৈতিকতা), অর্থ (সমৃদ্ধি), কাম (আকাঙ্খা) ও মোক্ষ (ঈশ্বর প্রাপ্তি) এই চারটি অর্জনের লক্ষ্যে পালন করা হয়, যাকে একসাথে বলা হয় পুরুষার্থ; সেইসাথে আছে কর্ম এবং সংসার (মৃত্যু ও পুনর্জন্মের চক্র)। যজ্ঞ, ধ্যান, পূজা, কীর্তন, ইষ্টনাম জপ, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দয়া, সংযম, ধৈর্য, প্রাণীর প্রতি অহিংসা ইত্যাদি চিরন্তন নৈতিক জীবনাচরণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাহ্যিক আচরণ পালন অপেক্ষা মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে, যা অর্জনের জন্য কেউ কেউ জাগতিক বস্তুগত সম্পদ ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করে থাকে।

বর্তমানে হিন্দুধর্মের চারটি বৃহত্তম সম্প্রদায় হল বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম, শাক্তধর্ম এবং স্মার্তবাদ। হিন্দু গ্রন্থগুলিতে কর্তৃত্ব এবং চিরন্তন সত্যের উৎসগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবে এই সত্যগুলির বোঝাপড়া আরও গভীর করতে এবং

ঐতিহ্যকে আরও উন্নত করার জন্য কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার একটি শক্তিশালী হিন্দু ঐতিহ্যও রয়েছে।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো শ্রুতি ("শোনা") এবং স্মৃতি ("স্মরণীয়") প্রধানত দুটি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। বেদ, উপনিষদ্‌, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে বেদ হচ্ছে সর্বপ্রধান, সর্বপ্রাচীন ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ। আবার ছয়টি আস্তিক দর্শন রয়েছে যা বেদের স্বীকৃতি দেয়। যথা: সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা এবং ব্রহ্মসূত্র। যদিও পুরাণকাল বিদ্যাশাস্ত্র হাজার বছরের একটি বংশানুক্রমিক উপস্থাপন করে, বৈদিক ঋষিদের থেকে শুরু করে, পণ্ডিতরা হিন্দুধর্মকে বিভিন্ন ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে ব্রহ্মতান্ত্রিক অর্থোপ্রাক্সির সংমিশ্রণ বা সংশ্লেষণ হিসাবে বিবেচনা করেন, যার বিভিন্ন শিকড় রয়েছে এবং কোনও নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা নেই। এই হিন্দু সংশ্লেষণ বৈদিক যুগের পরে উদ্ভূত হয়, আনু. ৫০০-২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং আনু. ৩০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে, দ্বিতীয় নগরায়নের সময় এবং হিন্দুধর্মের প্রাথমিক ধ্রুপদী যুগে, যখন মহাকাব্য এবং প্রথম পুরাণ রচনা করা হয়েছিল। এটি মধ্যযুগীয় যুগে উন্নতি লাভ করে, ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পতনের সাথে সাথে।

হিন্দুধর্মের ইতিহাস ভারতীয় উপমহাদেশের স্থানীয় বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে । এটি লৌহ যুগ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মের বিকাশের সাথে মিলে যায়, এর কিছু ঐতিহ্য প্রাগৈতিহাসিক ধর্ম যেমন ব্রোঞ্জ যুগের সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার সাথে সম্পর্কিত । হিন্দুধর্মকে এজন্য বিশ্বের "প্রাচীনতম ধর্ম" বলা হয়।পণ্ডিতরা হিন্দুধর্মকে বিভিন্ন উৎস থেকে উদ্ভুত ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ হিসাবে মনে করেন, যার একক প্রতিষ্ঠাতা নেই।

৯ শতক থেকে ২১ শতক পর্যন্ত হিন্দু শিল্পকর্ম এবং মন্দির হিন্দুধর্মের ইতিহাস প্রায়শই বিকাশের সময়কালে বিভক্ত। প্রথম সময়কাল হল প্রাক-বৈদিক যুগ, যার মধ্যে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা এবং স্থানীয় প্রাক-ঐতিহাসিক ধর্ম রয়েছে, যা প্রায় ১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে

শেষ হয় । খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ এর মধ্যে কোনো সময়ে ইন্দো-আর্য অভিবাসনের সাথে ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্মের প্রবর্তন শুরু হয় এবং উত্তর ভারতে বৈদিক যুগের সূচনা হয়।

মোটামুটিভাবে ৬৫০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দের পর ধ্রুপদী পৌরাণিক হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠালাভ করে মধ্যযুগে। আদি শংকরের অদ্বৈত বেদান্ত মতবাদও এই সময় প্রচারিত হয়। উক্ত মতবাদ বৈষ্ণব ও শৈব মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং স্মার্তধর্মের উত্থান ঘটায়। এর ফলে দর্শনের অবৈদান্তিক শাখাগুলির অবলুপ্তি ঘটে।

১২০০ থেকে ১৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হিন্দু ও ইসলামী উভয় শাসকের অধীনে হিন্দুধর্ম ভক্তি আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য দেখা যায়, যা আজও প্রভাবশালী রয়েছে। ঔপনিবেশিক যুগে বিভিন্ন হিন্দু সংস্কার আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে যা আংশিকভাবে পশ্চিমা আন্দোলন, যেমন একতাবাদ এবং থিওসফি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের ফলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব হয়।

হিন্দু ধর্ম ভারত, নেপাল এবং মরিশাসের উপর সর্বাধিক স্বীকৃতপ্রাপ্ত বিশ্বাস বালি, ইন্দোনেশিয়া,ক্যারিবিয়ান, উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, ওশেনিয়া, আফ্রিকা এবং অন্যান্য অঞ্চল সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায় পাওয়া যায়।

খ্রিস্টান ধর্ম :

তিনটি মহান একেশ্বরবাদী ধর্মের মধ্যে, খ্রিস্টধর্মের একটি আলাদা স্থান রয়েছে কারণ এই ধর্মের ত্রিত্ববাদী ধর্ম তার ক্লাসিক আকারে, ইহুদি ও ইসলামের একতাবাদী ধর্মের বিপরীতে। খ্রিস্টান বাইবেল, নিউ টেস্টামেন্ট সহ , এর মতবাদ সম্পর্কে কোন ত্রিত্ববাদী বিবৃতি বা অনুমান নেই।ট্রিনিটি —শুধুমাত্র ট্রায়াডিক লিটারজিকাল সূত্র যা ঈশ্বর পিতা,

পুত্র এবং পবিত্র আত্মাকে আহ্বান করে । এটা সত্য যে খ্রিস্টধর্মেরও তার একতাবাদী ছিল , যেমন 16 শতকের ইতালীয় ধর্মতত্ত্ববিদ ফস্টাস সোসিনাস , কিন্তু এই ধর্মটি তার তিনটি ক্লাসিক ফর্ম রোমান ক্যাথলিকবাদ , পূর্ব অর্থোডক্সি এবং প্রোটেস্ট্যান্টিজমে তিন ব্যক্তিতে এক ঈশ্বরকে স্বীকার করে: পিতা ঈশ্বর, ঈশ্বর পুত্র, এবং ঈশ্বর পবিত্র আত্মা. খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব অনুসারে , এই স্বীকৃতি তিনটি দেবতার স্বীকৃতি নয় কিন্তু এই তিন ব্যক্তি মূলত এক, বা গোঁড়ামি হিসাবে , প্রাথমিক চার্চ ফাদার দ্বারা প্রবর্তিত টারটুলিয়ান (সি. 160-পরবর্তী 220), এটি আছে: তিন ব্যক্তি এবং একটি পদার্থ। এই ধারণাটি দ্বন্দ্ব ছাড়াই গৃহীত হয়নি, যেমনটি তৃতীয় এবং চতুর্থ

শতাব্দীর ধর্মতাত্ত্বিক বিরোধ দ্বারা প্রমাণিত। এটা স্পষ্ট যে ত্রিত্ববাদী অনুমান প্লুরিফর্ম একেশ্বরবাদের চিন্তাধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অবশ্যই, এই ঘটনাগুলির মধ্যে কোন ঐতিহাসিক সংযোগ থাকার সম্ভাবনা নেই; প্রধান পার্থক্য হল যে খ্রিস্টধর্ম, একেশ্বরবাদী ধর্ম হিসাবে, নিজেকে তিনটি ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে, যেখানে আদিম ধর্মগুলির একটি ঐশ্বরিক পদার্থের সম্ভাব্য রূপের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করার কোন কারণ নেই। অন্যান্য ধর্মের মতো যেগুলি একটি বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে এবং একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, খ্রিস্টধর্ম বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে উপস্থিত হয়।

খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস হল ১ম শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত খ্রিস্টীয় ধর্ম, খ্রিস্টীয় বিশ্ব ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত চার্চের বিবরণ।

মধ্যপ্রাচ্যের (বর্তমান ইসরায়েল রাষ্ট্রের উত্তরভাগে অবস্থিত) ঐতিহাসিক গালীল অঞ্চলের নাসরত শহর থেকে আগত ইহুদি বংশোদ্ভূত ধর্মীয় নেতা যিশুখ্রিস্টের জীবন ও শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে খ্রিস্টীয় ১ম শতকে ধর্মটির উৎপত্তি হয়। ঐতিহাসিকভাবে নাসরতের যিশু খ্রিস্টীয় ১ম শতকের প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের প্রদেশ যিহূদিয়াতে (ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন অঞ্চলের পার্বত্য দক্ষিণাংশ) বসবাসকারী একজন ধর্মপ্রচারক ও নৈতিক শিক্ষক ছিলেন। যিশুর পালক বাবা যোসেফ ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রী। কিন্তু

যিশুর অনুসারীরা অর্থাৎ খ্রিস্টানেরা বিশ্বাস করে একজন মাত্র ঈশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্যের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের পিতা। পিতারূপী ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে সন্তানের মতো ভালোবাসেন এবং তার সাথে সম্পর্ক রাখতে চান। কিন্তু প্রতিটি মানুষ পাপ করার প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে (যার উৎস প্রথম মানব আদমের আদিপাপ)। এই সব ছোট-বড় পাপের কারণে মানুষ ও জগতের পিতা ঈশ্বরের মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি হয়। খ্রিস্টানেরা বিশ্বাস করে যে যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বরেরই দ্বিতীয় একটি রূপ; তিনি ঈশ্বরের একমাত্র প্রকৃত পুত্র। ঈশ্বরের তৃতীয় আরেকটি রূপ হল পবিত্র আত্মা।

এই ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেন -

[৫:৭৩] আল মায়িদাহ

لَقَد كَفَرَ الَّذينَ قالوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَما مِن إِلٰهٍ إِلّا إِلٰهٌ واحِدٌ وَإِن لَم يَنتَهوا عَمّا يَقولونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذينَ كَفَروا مِنهُم عَذابٌ أَليمٌ

অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তিন জনের তৃতীয়জন'। যদিও এক ইলাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আর যদি তারা যা বলছে, তা থেকে বিরত না হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করবে।

পবিত্র আত্মা বিভিন্ন নবী বা ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে মানবজাতির সাথে যোগাযোগ করেছে। পবিত্র আত্মারূপী ঈশ্বর মানব কুমারী মেরির গর্ভে পুত্ররূপী ঈশ্বর তথা যিশুখ্রিস্টের জন্ম দেন, যার সুবাদে যিশুখ্রিস্ট রক্তমাংসের মানুষের রূপ ধারণ করে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসেন। পবিত্র আত্মারূপী ঈশ্বরের সুবাদে পুত্ররূপী ঈশ্বর যিশুখ্রিস্ট পৃথিবীতে বহু অলৌকিক কাজ সম্পাদন করেন। যেমন খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থগুলিতে

বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী তিনি দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে পারতেন, এমনকি মৃত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারতেন। এসব অলৌকিক ঘটনা সম্পাদনের প্রেক্ষিতে যিশুকে ইহুদিদের রাজা হিসেবে দাবী করা হয়। এই উপাধি ব্যবহার ও নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে দাবী করার দোষে জেরুসালেমের ইহুদি নেতাদের নির্দেশে যিশুকে জেরুসালেমে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহুদিদের সর্বোচ্চ আদালতে তার বিচার হয় ও ইহুদিরা যিহূদিয়ার স্থানীয় রোমান প্রশাসক পোন্তিউস পীলাতকে অনুরোধ করে যেন যিশুকে মৃত্যদণ্ড দান করা হয়। পীলাত প্রথমে যিশুকে নিরপরাধ গণ্য করলেও পরবর্তীতে যাজকদের প্ররোচণায় উন্মত্ত ইহুদি জনতার ইচ্ছাপূরণ করতে যিশুকে

ক্রুশবিদ্ধ করে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করান।

এই ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেন :

[৪:১৫৭] আন নিসা

وَقَولِهِم إِنّا قَتَلنَا المَسيحَ عيسَى ابنَ مَريَمَ رَسولَ اللَّهِ وَما قَتَلوهُ وَما صَلَبوهُ وَلٰكِن شُبِّهَ لَهُم وَإِنَّ الَّذينَ اختَلَفوا فيهِ لَفي شَكٍّ مِنهُ ما لَهُم بِهِ مِن عِلمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ وَما قَتَلوهُ يَقينًا

এবং তাদের এ কথার কারণে যে, 'আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম পুত্র ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি'। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে শূলেও চড়ায়নি। বরং তাদেরকে ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। আর নিশ্চয় যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল, অবশ্যই তারা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।

অপর এক জায়গায় বলা হয়েছে :

[৩:৫৫] আল ইমরান

إِذ قالَ اللَّهُ يا عيسى إِنّي مُتَوَفّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذينَ كَفَروا وَجاعِلُ الَّذينَ اتَّبَعوكَ فَوقَ الَّذينَ كَفَروا إِلى يَومِ القِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرجِعُكُم فَأَحكُمُ بَينَكُم فيما كُنتُم فيهِ تَختَلِفونَ

স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, 'হে ঈসা, নিশ্চয় আমি তোমাকে পরিগ্রহণ করব, তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নেব এবং কাফিরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করব। আর যারা তোমার আনুগত্য করেছে তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপরে প্রাধান্য দেব। অতঃপর আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। তখন আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেব, যে ব্যাপারে তোমরা মতবিরোধ করতে' ।

এরপর জেরুজালেম থেকে সমগ্র নিকট প্রাচ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রসারলাভ করেছিল। আরাম, আসিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, ফিনিশিয়া, এশিয়া মাইনর, জর্ডান ও মিশর ছিল ৩ সালে আকসুমাইট সাম্রাজ্যে এবং ৩৮০ সালে রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টধর্ম রাজধর্মের স্বীকৃতি পায়। ৪৫১ সালে কাউন্সিল অফ ক্যালসেডন খ্রিস্টধর্মকে ওরিয়েন্টাল অর্থোডক্সি ও ক্যালসিডোনীয় খ্রিস্টধর্ম – এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে দেয়। ১০৫৪ সালে মহাবিভাজনের সময় ক্যালসিডনীয় খ্রিস্টধর্ম রোমান ক্যাথলিক চার্চ ও ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চে বিভক্ত হয়ে যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রোটেস্টান্ট সংস্কার আন্দোলন শুরু হলে রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি নতুন খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। পরে এই সম্প্রদায় থেকে অনেকগুলি পৃথক খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়।

মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিক ও ইস্টার্ন অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্ম সমগ্র ইউরোপে প্রসারিত হয়েছিল। নবজাগরণের সময় থেকে শুরু করে ইউরোপের আবিষ্কার যুগে খ্রিস্টধর্ম সারা পৃথিবীতে প্রসারিত হয়। এর ফলে এই ধর্ম বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। বর্তমানে পৃথিবীতে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা দুইশ কোটি, যা বিশ্বের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি।

খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা একটি ধর্মীয় পুস্তকসমগ্র অনুসরণ করে, যার সামগ্রিক নাম বাইবেল। বাইবেলের পুস্তকগুলিকে দুইটি বড় অংশে ভাগ করা হয়েছে: পুরাতন নিয়ম

ও নতুন নিয়ম। খ্রিস্টানেরা বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের সমস্ত পুস্তককে ঈশ্বরের পবিত্র বাণী হিসেবে গণ্য করেন। পুরাতন নিয়ম অংশটি হিব্রু বাইবেল (বা তানাখ) এবং অব্রাহামের পৌত্র যাকব তথা ইসরায়েলের বংশধরদের লেখা অনেকগুলি ধর্মীয় পুস্তক নিয়ে গঠিত। খ্রিস্টধর্মের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখা ক্যাথলিক মণ্ডলীতে অনুমোদিত পুস্তকতালিকা অনুযায়ী বাইবেলের পুরাতন নিয়ম অংশে ৪৬টি পুস্তক আছে। এই পুস্তকগুলি বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন সময়ে খ্রিস্টপূর্ব ৮ম শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতক পর্যন্ত মূলত হিব্রু ভাষাতে রচিত হয়।

বাইবেলের দ্বিতীয় অংশটির নাম নতুন নিয়ম, যা ২৭টি পুস্তক নিয়ে গঠিত। এই পুস্তকমালাতে যিশুর জীবন, শিক্ষা ও খ্রিস্টীয় ১ম শতকে তার অনুসারীদের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।[৩৬] নতুন নিয়মের বিভিন্ন পুস্তক খ্রিস্টীয় ১ম শতকেই পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সেসময়ে অতি প্রচলিত গ্রিক ভাষাতে রচিত হয়, পরে খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতকে এসে ৩৯৭ খ্রিস্টাব্দে ক্যাথলিক মণ্ডলীর ধর্মীয় নেতারা উত্তর আফ্রিকার কার্থেজ শহরে আয়োজিত একটি সম্মেলনে নতুন নিয়মের পুস্তকগুলির একটি সঠিক তালিকা অনুমোদন ও প্রণয়ন করেন। নতুন নিয়মের প্রথম চারটি পুস্তককে একত্রে সুসমাচার নামে ডাকা হয়; এগুলিতে যিশুর জীবন, তার মৃত্যু এবং মৃত অবস্থা থেকে তার পুনরুত্থানের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের ক্ষত্রে আল্লাহ বলেন :

[৩:৭৮] আল ইমরান

وَإِنَّ مِنهُم لَفَريقًا يَلوونَ أَلسِنَتَهُم بِالكِتابِ لِتَحسَبوهُ مِنَ الكِتابِ وَما هُوَ مِنَ الكِتابِ وَيَقولونَ هُوَ مِن عِندِ اللَّهِ وَما هُوَ مِن عِندِ اللَّهِ وَيَقولونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُم يَعلَمونَ

তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা নিজদের জিহবা দ্বারা বিকৃত করে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা সেটা কিতাবের অংশ মনে কর, অথচ সেটি কিতাবের অংশ নয়। তারা বলে, 'এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে', অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। আর তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা বলে, অথচ তারা জানে।

ইহুদি ধর্ম :

ইহুদি ধর্ম (হিব্রু ভাষায়: יְהוּדִים য়েহুদীম্) একটি প্রাচীন অব্রাহামীয় একেশ্বরবাদী ধর্ম। ধারণাগত মিল থেকে ধর্মতাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে, ইহুদিধর্মের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠেছে খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম ও দ্রুজ, বাহা'ইধর্ম প্রভৃতি অব্রাহামীয় ধর্ম। এই ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পুরাতন নিয়ম-এর প্রথম পাঁচটি বইকে গণ্য করা হয়: আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনাপুস্তক, এবং দ্বিতীয় বিবরণ। এই পাঁচটি বইকে একত্রে "তোরাহ"ও বলা হয়ে থাকে। 'তোরাহ' শব্দটির অর্থ ' আইন '।

ইহুদি বিশ্বাসমতে, ঈশ্বর এক, আর তাঁকে যিহোভাহ (Jehovah, YHWH) নামে আখ্যায়িত করা হয়। মোশি হলেন ঈশ্বরের একজন বাণীবাহক। ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মতোই ইহুদিগণ পূর্বতন সকল বাণীবাহককে বিশ্বাস করেন, এবং মনে করেন মালাশী সর্বশেষ বাণীবাহক। ইহুদিগণ যিশুকে ঈশ্বরের বাণীবাহক হিসেবে অস্বীকার করলেও, খ্রিস্টানগণ ইহুদিদের সবগুলো ধর্মগ্রন্থ (পুরাতন নিয়ম)-কে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মান্য করে থাকেন। ইহুদিধর্মকে সেমেটিক ধর্ম হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

'ইহুদি' শব্দটি এসেছে শব্দ 'ইয়াহুদা' থেকে যিনি ছিলেন নবী মোশির পূর্বপুরুষ ও ইয়াকুব এর পুত্র ও নবী ইউসুফ এর বড় ভাই । তবে ইহুদি শব্দের শাব্দিক অর্থ হয় 'প্রশংসাকারী', এখানে ঈশ্বরের প্রশংসাকারী। যদিও এ ধর্মের প্রবর্তক মুসা কিন্তু ইহুদিরা বলেন এ ধর্মের প্রবর্তক আব্রাহাম । ইহুদি ধর্মের বয়স প্রায় ৪০০০ বছর । ইহুদীদের ধর্মযাজককে 'রাব্বি'(গুরু) বলা হয়।

প্রায় ২০০০ বছরের ইতিহাসে ইহুদি জনগণ এবং ইহুদি ধর্মের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় দিক ছিল এর অভিযোজন এবং অবিচ্ছিন্নতা। প্রাচীন মিশর বা ব্যাবিলনিয়া সাম্রাজ্য থেকে শুরু করে আধুনিক পশ্চিমা খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী এবং আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সাথে মিথস্ক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছে ইহুদিবাদকে। প্রতিটি গোষ্ঠী এবং মতাদর্শ থেকে বেশ কিছু জিনিস ইহুদি সমাজ-ধর্মীয় কাঠামোতে যুক্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যও কখনও ক্ষুণ্ন হয় নি। এভাবেই একদিকে অভিযোজিত হয়েছে এই ধর্মটি এবং অন্যদিকে তার মৌলিক ঐতিহ্যকে অটুট রেখেছে। এ কারণে যেকোন সময়ের ইহুদি ঐতিহ্য তার পূর্বের সকল ইহুদি ঐতিহ্যের সমন্বয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। কোন এক যুগে যত অভিনবত্ব বা বিবর্তনই আসুক না কেন ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে সবসময়ই প্রাচীনত্ব বজায় রেখেছে ইহুদিরা।

ইহুদি ধর্মের মূল শিক্ষা প্রায় সবসময়ই একেশ্বরবাদকে করে আবর্তিত হয়েছে। ইহুদিদের মধ্যে অনেক শ্রেণী-উপশ্রেণী থাকলেও এই একটি বিষয়ে কারও মধ্যে দ্বিমত নেই। সবাই এক বাক্যে কেবল এক ঈশ্বরকে মেনে নেয়। একেশ্বরবাদ প্রকৃতপক্ষে সার্বজনীন ধর্মের ধারণা দেয় যদিও এর সাথে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যবাদ (particularism) যুক্ত রয়েছে। প্রাচীন ইসরায়েলে এই স্বাতন্ত্র্যবাদ নির্বাচনের রূপ নিয়েছিল। নির্বাচন বলতে ঈশ্বর কর্তৃক মানুষের মধ্য থেকে কাউকে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করাকে বোঝায়। সেই তখন থেকেই ইহুদিরা মনে করতো, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একটি পূর্বপরিকল্পিত চুক্তিপত্র (কোভেন্যান্ট) থাকতে বাধ্য; সবাইকে এই চুক্তিপত্র মেনে চলতে হবে; না চললে পরকালে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। ইহুদিদের এই চিন্তাধারার সাথে messianism এর সুন্দর সমন্বয় ঘটেছিল।

তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন -

[৫:৬৪] আল মায়িদাহ

وَقالَتِ اليَهودُ يَدُ اللَّهِ مَغلولَةٌ غُلَّت أَيديهِم وَلُعِنوا بِما قالوا بَل يَداهُ مَبسوطَتانِ يُنفِقُ كَيفَ يَشاءُ وَلَيَزيدَنَّ كَثيرًا مِنهُم ما أُنزِلَ إِلَيكَ مِن رَبِّكَ طُغيانًا وَكُفرًا وَأَلقَينا بَينَهُمُ العَداوَةَ وَالبَغضاءَ إِلى يَومِ القِيامَةِ كُلَّما أَوقَدوا نارًا لِلحَربِ أَطفَأَهَا اللَّهُ وَيَسعَونَ فِي الأَرضِ فَسادًا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ المُفسِدينَ

আর ইয়াহূদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত বাঁধা'। তাদের হাতই বেঁধে দেয়া হয়েছে এবং তারা যা বলেছে, তার জন্য তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছে। বরং তার দু'হাত প্রসারিত। যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং তোমার উপর তোমার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী বাড়িয়েই দিচ্ছে। আর আমি তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও ঘৃণা ঢেলে দিয়েছি। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। আর তারা যমীনে ফাসাদ করে বেড়ায় এবং আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না।

সকল ধর্ম বিশ্বাসে সৃষ্টিতত্ত্ব

যেকোনো ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সৃষ্টিতত্ত্ব। মহাবিশ্ব, বস্তু-জীব জগৎসহ সবকিছু এর অন্তর্ভুক্ত। এর ভিত্তিতে ধর্মীয় বিশ্বাসের মৌল সত্যগুলো নির্ধারিত হয়। মানুষ কীভাবে ও কেন এল এর উপরে নির্ধারিত হয় তার ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মপালন।

পুরানো বাইবেল-এ আছে হিব্রুসৃষ্টিতত্ত্ব। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্ম বিশ্বাস করে এই সৃষ্টিতত্ত্বে, অর্থাৎ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ মানে এবং বিভ্রান্ত হয় এটি দিয়ে। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বমৌলিক নয়, এর অনেকখানি ধার করা হয়েছে ব্যাবিলনি সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে; এবং এর নানা মিল রয়েছে হিন্দুসৃষ্টিতত্ত্বের সাথেও।

বেদের ‘নাসাদীয় সূক্ত এবং ‘হিরণ্যগর্ভ সূক্ত’— দুটিই হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের সপক্ষে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

নাসাদীয় সূক্তে বলা হয়েছে, ‘নাসাদাসিস নঃ সদাসিত্ তদানীম নাসিদ রজ ন ব্যামাপ্রোন যৎ…। (ঋগ্বেদ, ১০/১২৯/১)। অর্থাৎ সেকালে যা নেই তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না। পৃথিবী ছিল না, অতি দূরবিস্তৃত আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল?

আরেকটি সূক্তে আছে, ‘তম অসিৎ তমস…তপসস্তন্মাহিনাজায়াতৈকম (ঋগ্বেদ, ১০/১২৯/৩)। অর্থাৎ চারদিক ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। সমস্ত জিনিস একত্রে পুঞ্জীভূত ছিল। সেখান থেকে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হল।

হিরণ্যগর্ভ সূক্তে বলা হয়েছে, ‘আপন হ য়দ বৃহাতিবিশ্বমা য়ান গর্ভম…।’ (ঋগ্বেদ, ১০/১২১/৭)। অর্থাৎ সর্বপ্রথম হিরণ্যগর্ভই সৃষ্টি হল অর্থাৎ সর্বপ্রথম জলময় প্রাণের উৎপত্তি হয়। এখানে প্রথম প্রাণকে প্রজাপতি (ব্রহ্ম) বলা হয়েছে।

আরেকটি সূক্তে আছে, ‘হিরণ্যগর্ভানি অপঃ তে সলিলা…। ঋগ্বেদ, (১০/৭২/২) অর্থাৎ প্রথমে হিরণ্যগর্ভ সৃষ্ট হল। সেখানে ছিল উত্তপ্ত গলিত তরল। এটি ছিল মহাশূন্যে ভাসমান। বছরের পর বছর এই অবস্থা অতিক্রান্ত হয়। তারপর সেখানে বিস্ফোরণ ঘটল গলিত পদার্থ থেকে, বিন্দু থেকে যেন সব প্রসারিত হতে শুরু হল।… সেই বিস্ফোরিত অংশসমূহ থেকে বিভিন্ন গ্রহ, নক্ষত্র তৈরি হল। (ঋগ্বেদ, ১০/৭২/৩)।

‘তার এক জীবনপ্রদ অংশ থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হল।’ (ঋগ্বেদ, ১০/৭২/৪)। ‘তারপর সৃষ্ট ক্ষেত্রে সাত ধাপে সংকোচন-প্রসারণ সম্পন্ন হল। তারপর সৃষ্টি হল ভারসাম্যের।’ (ঋগ্বেদ, ১০/৭২৮-৯)। একই কথা আরেকটি সূক্তে বলা হয়েছে, ভুরি পরিমাণ জল

সমস্ত বিশ্বভূবন আচ্ছন্ন করে ছিল, সেখানে অগ্নির উৎপত্তি হয়। এভাবে গলিত উত্তপ্ত তরল থেকে প্রাণরূপ দেবতার উদ্ভব হয়। (ঋগ্বেদ, ১০/১২১/৭)।

আর বাইবেলে বলা হয়েছে 'ঈশ্বর মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করলেন এবং তার নাক দিয়ে জীবনের নিঃশ্বাস ফুঁকে দিলেন, আর মানুষ জীবন্ত হল' (জেনেসিস ২ : ৭)। আদিপুস্তক-এর 'জগৎ-সৃষ্টির বিবরণ'-এ বলা হয়েছে 'পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিত ছিল।... পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক, ও জলকে দুই ভাগে পৃথক করুক। ঈশ্বর এইভাবে বিতান করিয়া বিতানের ঊর্ধ্বস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক করিলেন; তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন।'

পবিত্র কোরআনেও বলা হয়েছে -

[৭:৫৪] আল আরাফ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ في سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ استَوى عَلَى العَرشِ يُغشِي اللَّيلَ النَّهارَ يَطلُبُهُ حَثيثًا وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمرِهِ أَلا لَهُ الخَلقُ وَالأَمرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ العالَمينَ

নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে উঠেছেন। তিনি রাতকে দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজী, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব।

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হন। তিনিই আবৃত করেন রাত্রি দ্বারা দিনকে যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে, তিনিই সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই আদেশের অনুবর্তী। জেনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ প্রদান করা। আল্লাহ্ বরকতময়, সারা জাহানের প্রতিপালক (ইফা)। দেখা যাচ্ছে সৃষ্টি তত্ত্বে বাইবেল বর্ণিত পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টির প্রদেয় তথ্যের সাথে কোরআনে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

তবে বাইবেলের ঈশ্বর আদিম জলরাশিকে মঞ্চের সাহায্যে দু-ভাগ করে, যার ওপর স্থাপন করেন গগনমণ্ডল। ব্যাবিলনি সৃষ্টিতত্ত্বের তিয়াওয়াথের লাশ দু-ভাগ করার সাথে এর মিল আছে। বাইবেলে আছে, 'পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল।'

মুসলিম মতে, আদমই আদিপিতা। আর আদম থেকেই আদমি (মানে মানুষ) কথাটির উৎপত্তি। ইহুদি-খ্রিষ্টান-মুসলমান মতেও নূহকে 'দ্বিতীয় আদম' বলা হয়েছে। 'আদম' শব্দটির উৎস হচ্ছে হিব্রু শব্দ 'আদামা', 'আদামা' অর্থ মৃত্তিকা। আদম শব্দটি ইহুদি-খ্রিষ্টান-মুসলিম পরিশেষে মানব জাতির আদি পিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সে মতে শব্দটি নামবাচক। কিন্তু শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে নানা কথা চালু রয়েছে। তখন তা আর শুধু নামবাচক মনে হয় না। কারো মতে শব্দটি আরব, কারো মতে অনারব তথা হিব্রু। এদিক থেকে আদম শব্দের আবিধানিক অর্থ সভ্যতা।আরবি ছাড়াও হিব্রু, সুরিয়ানি প্রভৃতি ভাষায় আদম শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সৃষ্টিকর্তা কি মাত্র একজনই?

সৃষ্টিকর্তা একটি বাংলা শব্দ (ইংরেজি: Creator, আরবি: الخالق - আল খালিক); যিনি সৃষ্টি করেন তাকেইই সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসীরা যে মহান অস্তিত্ব সময়, স্থান, জীব, মহাকাশসহ সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন তাকে সৃষ্টিকর্তা বা স্রষ্টা নামে সম্বোধন করে। বিশ্বাসীরা এই মহাবিশ্বের জীব ও জড় সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক আছে বলে বিশ্বাস করে; এদেরকে আস্তিক বলা হয়। আবার অনেকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাদের বলা হয় নাস্তিক। সৃষ্টিকর্তা একটি অধিক ব্যবহৃত বাংলা শব্দ যা মূলত বিধাতা,ভগবান, ঈশ্বর, ইলাহি, আল্লাহ প্রভৃতি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভাবা হয়, তিনি জাগতিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ অবস্থানে অবস্থানকারী কোন অস্তিত্ব।

মানুষ হিসেবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমার একজন সৃষ্টিকর্তা আছে। আমি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান যে কোন ধর্মের হতে পারি, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা একজনই। কারন বহু সৃষ্টিকর্তা থাকলে সুশৃঙ্খল নিয়ম প্রয়োগ করে এই বিশ্ব জগতের সকল কিছুর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কোনোক্রমেই সম্ভব হতো না। একাধিক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব যদি সত্যিই থেকে থাকতো তাহলে প্রত্যেক সৃষ্টিকর্তা তার অভিমত ও ক্ষমতার প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হতেন। ফলে শৃঙ্খলা রক্ষা করা যেত না; যার নিশ্চিত পরিণতি হতে পারতো, সমগ্র সৃষ্টিকুলের ধ্বংস হয়ে যাওয়া। সকল কিছুর সুষ্ঠু পরিচালনা, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা এবং সুনিয়ন্ত্রিত কার্যপরিকল্পনা প্রমান করে- সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই একজন। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং নিরঙ্কুশভাবে সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। তাই বুঝা যায়, সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজনই। আর তিনি হলেন আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা। আল্লাহ তাআ'লাকেই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা (আল খালিক) সাব্যস্ত করে।

এছাড়াও পবিত্র কুরআনে আল্লাহর আরো ৮১ টি ও পবিত্র হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় আরো ১৮ টি নামসহ মোট ৯৯ টি গুনবাচক নাম উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইসলামে সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয় সত্ত্বা। তাই তাকে সাধারণত "ঈশ্বর" বা "God" বলা হয় না; কারণ ঈশ্বরের স্ত্রী লিঙ্গ "ঈশ্বরী" বা "Goddess" রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কোনো স্ত্রী বা সন্তান নেই।

আল্লাহ বলেন -

[২:১১৬] আল বাকারা

وَقالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبحانَهُ بَل لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ كُلٌّ لَهُ قانِتونَ

আর তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান; বরং আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই । সব তাঁরই অনুগত।

অপর এক আয়াতে বলা হয় -

[২:২৫৫] আল বাকারা

اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ الحَيُّ القَيّومُ لا تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَومٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَرضِ مَن ذَا الَّذي يَشفَعُ عِندَهُ إِلّا بِإِذنِهِ يَعلَمُ ما بَينَ أَيديهِم وَما خَلفَهُم وَلا يُحيطونَ بِشَيءٍ مِن عِلمِهِ إِلّا بِما شاءَ وَسِعَ كُرسِيُّهُ السَّماواتِ وَالأَرضَ وَلا يَئودُهُ حِفظُهُما وَهُوَ العَلِيُّ العَظيمُ

আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান।

আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। -সূরা আল বাকারাহ, আয়াত-১১৭

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেছেন-

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল পায়। তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। -সূরা আল জাছিয়াহ, আয়াত-২২

অন্য আয়াতে বলেন -

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুস্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। -সূরা আশ শূরা, আয়াত-১১

সূরা ইখলাসে তিনি ইরশাদ করেছেন-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

বলুন, তিনি আল্লাহ, এক,

اللَّهُ الصَّمَدُ

আল্লাহ অমুখাপেক্ষী,

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। -সূরা ইখলাস, আয়াত-০১ - ০৪

ইসলামের হাকিকাত

শরীয়ত, তরীকত, মারিফত ও হাকীকত এগুলো সমাজে প্রচলিত অতি পরিচিত চারটি পরিভাষা।

হাকীকত বা হাকিকত (আরবি: حقيقة) বাংলা অর্থ - সত্য বা বাস্তব। ইহজাগতিক সব ভোগ-লালসা ,সময়ের বিভ্রান্তি, দেহভার প্রভৃতি মুক্ত হওয়া হচ্ছে হাকীকার শিক্ষা।

ইসলামী গবেষক ও পন্ডিতদের মাঝে হাকীকত কি এবং কীভাবে এটি এখনো আলোচিত ও গবেষণা চলমান বিষয়। 'ইসলামিক ফিলোসফিক্যাল থিওলজি' বইটিতে বলা হয়েছে হাকীকত হচ্ছে: "

"কোনটি বাস্তব, অকৃত্রিম, কোনটি সত্য ও বিভ্রান্তি নয় জানা এবং মহাজাগতিক স্থিতি লাভ করা।"

ঈশ্বরে সান্নিধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞান সর্বোত্তম হাকীকা। ত্বরীকা অর্জন বা লাভের পর হাকীকত অর্জন করা যায়। উদাহরণ: যে শায়খ শরীয়াহ ও ত্বরীকার জ্ঞান অর্জন করেছেন তিনি হাকীকা অর্জন করেছেন এবং তিনি তার শিষ্য কথা মুখ ফুটে বলার আগে বুঝতে পারেন, তিনি শারীরিক ভাষা পড়তে পারেন, কেউ অসুস্থ হলে বুঝতে পারেন এবং মানুষের মনের কথা অনুমান করতে পারেন। তিনি কথার ধরন ও বলার ভঙ্গি দেখে কারো জন্ম সময় ,জন্ম পরিবেশ বা স্থান, পরিবারের তথ্য, সমস্যা প্রভৃতি বলে দিতে পারেন। তিনি বহুমাত্রিক বা দৈহিক জগতের বাইরেও দেখতে পারেন। সুফিবাদে হাকীকাত হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতির একটি ধাপ। স্বল্প স্তর হলেও পরবর্তী ধাপ মারিফাত অর্জনে উচ্চতর স্তর চেতনা। অন্বেষীর জন্য এটি একটি ভাবনা,চর্চা ও অর্জনের বিষয়। যেটি অর্জনে অন্বেষীর জীবন স্থির,ওজনহীন, সময়ের মায়া প্রভৃতি হতে মুুুক্ত থাকে।

কুরআন-হাদীসে ''শরীয়ত'' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামের চারটি পর্যায় বা স্তর অর্থে তরীকত, মারেফত ও হাকীকত পরিভাষাগুলো কুরআন বা হাদীসে কোথাও ব্যবহৃত হয় নি। কখনোই কোনো সাহাবী, তাবিয়ী, প্রসিদ্ধ চার ইমাম বা অন্য কেউ ইসলামের চারটি স্তর বা পর্যায় হিসেবে এ পরিভাষাগুলি ব্যবহার করেন নি। প্রথমে শীয়াগণ এগুলি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করেন। পরে সুন্নী সরল সূফীগণের মধ্যে পরিভাষাগুলি প্রসার লাভ করে। বিশেষত, ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীর পর মিসর, ইয়ামান, ইরান, ইরাক, বাগদাদ ও মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শীয়াগণের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে শীয়া আকীদার অনেক কিছুই সাধারণ মুসলিমদের

মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আর এ সুযোগে জালিয়াতগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে হাদীস বানিয়ে বলেছে:

اَلشَّرِيْعَةُ شَجَرَةٌ وَالطَّرِيْقَةُ أَغْصَانُهَا وَالْمَعْرِفَةُ أَوْرَاقُهَا وَالْحَقِيْقَةُ ثَمَرُهَا

“শরীয়ত একটি বৃক্ষ, তরীকত তার শাখা-প্রশাখা, মারিফত তার পাতা এবং হাকীকত তার ফল।”

মিথ্যাচারিদের আল্লাহ লাঞ্চিত করুন। তাদের বানানো আরেকটি কথা:

اَلشَّرِيْعَةُ أَقْوَالِيْ وَالطَّرِيْقَةُ أَفْعَالِيْ وَالْحَقِيْقَةُ حَالِيْ وَالْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِيْ

“শরীয়ত আমার কথাবার্তা, তরীকত আমার কাজকর্ম, হাকীকত আমার অবস্থা এবং মারিফাত আমার মূলধন।”

তরিকত (আরবি: طريقة) যার বাংলা অর্থ: পদ্ধতি বা নিয়ম। হাকীকা সন্ধানে অন্বেষীরা যেভাবে আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করে প্রয়োগ বা গবেষণা বা তদন্ত বা যাচাই করে সে পদ্ধতি হচ্ছে ত্বরীকত।

ত্বরীকা অনুসারীদের বলা হয় 'মুরিদ। বেশ কিছু সুফি ত্বরীকা প্রচলিত রয়েছে।

যেমন: চিশতি, নকশবন্দি, কাদেরিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া,মাইজভাণ্ডারীয়া ইত্যাদি।

আধ্যাত্মিক ক্ষমতা লাভে ও সঠিক ত্বরীকা অনুসরণে একজন মুর্শিদ অন্বেষীকে সহায়তা করে থাকেন। ত্বরীকা অনুসারীদের 'মুরিদ' বলা হয়।যার অর্থ 'খোদার জ্ঞানকামী এবং স্রষ্টাপ্রেমী'। ত্বরীকতে সিলসিলা বা শৃঙ্খলা রয়েছে।নক্সেবন্দীর উদাহরণ দেখিয়ে বলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) থেকে আলি (রা.) পর্যন্ত ত্বরীকা এসেছিল। যে সব মুরিদ ত্বরীকার

অনুসারী হন তারা তাদের মুর্শিদ কর্তৃক দৈনিক দায়িত্ব-করণীয়-আমলের নির্দেশিকা পান।

আরবী মা'রিফাত (المعرفة) শব্দটি আরাফা (عرف) ক্রিয়াপদ থেকে গৃহীত। এর অর্থ (إدارك الشيء بحاسة من حواسه) কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে কোনো কিছু অবগত হওয়া বা পরিচয় লাভ করা। এভাবে মূলত ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান বা পরিচয়কে ''মারিফাত'' বলা হয়। তবে সাধারণত 'মারিফাত' বলতে ''জ্ঞান'', ''পরিচয়'' বা শিক্ষা (knowledge, education) বুঝানো হয়।

''শরীয়ত, তরীকত, হাকীকাত ও মারিফাত'' এ পর্যায়ক্রমিক ধারায় ''মারিফাত''-কে শরীয়তের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহ সুস্পষ্টভাবেই মারিফাতকে শরীয়তের নিম্নের স্থান দিয়েছে। 'জ্ঞান' অর্থে 'মারিফাত' ঈমান অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আল্লাহর মারিফাত বা আল্লাহর পরিচয় লাভ মানুষকে তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসের দিকে ধাবিত করে। তবে কুরআন-হাদীসে মূলত ''ইলম'' এবং ''ফিকহ''-এর প্রশংসা করা হয়েছে, ''মারিফাত''-এর কোনো বিশেষ প্রশংসা করা হয় নি। ''মারিফাত'' ঈমানের পথে পরিচালিত করলে তা প্রশংসনীয়। উপরন্তু কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ''মারিফাত'' অর্জনের পরেও মানুষ কুফর বা অবিশ্বাসে লিপ্ত হয়। কুরআনে একাধিক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহূদী-খৃস্টানদের অনেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর দীন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ''মারিফাত'' অর্জনের পরেও কুফরী করত। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِه

''অতঃপর যখন তাদের নিকট তা (কুরআন) আগমন করল, তারা তার মারিফাত অর্জনের (প্রকৃত পরিচয় জানার) পরেও কুফরী করল।''

َيَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُون

"আল্লাহর নিয়ামতের মারিফাত (প্রকৃত পরিচয়) তারা লাভ করে- অতঃপর তারা তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির।"

কুরআন-সুন্নাহ মুমিনদেরকে "মারিফাত" অর্জনের নির্দেশ দেয় নি, বরং ইলম অর্জনের নির্দেশ দিয়েছে; কারণ "মারিফাত" তো ঈমান অর্জনের পূর্বের অবস্থা। কিন্তু শীয়াগণ মারিফাতকে ঈমান, ইসলাম ও শরীয়ত থেকে পৃথক উচ্চপর্যায়ের বিষয় বলে প্রচার করেন এবং মারিফাতকে "তত্ত্বজ্ঞান" বা গোপন বা পৃথক কোনো জ্ঞান বলে প্রচার করেন। এ সকল বিভ্রান্তির অপনোদনে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর নিম্নের বক্তব্য প্রণিধানযোগ:

نَعْرِفُ اللهَ تَعَالَي حَقَّ مَعْرِفَتِهِ كَمَا وَصَفَ اللهُ نَفْسَهُ فِيْ كِتَابِهِ بِجَمِيْعِ صِفَاتِهِ .. وَيَسْتَوِيْ الْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ فِيْ الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِيْنِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْمَحَبَّةِ وَالرِّضَا وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالإِيْمَانِ فِيْ ذَلِكَ، وَيَتَفَاوَتُوْنَ فِيْمَا دُوْنَ الإِيْمَانِ فِيْ ذَلِكَ كُلِّه.

"মহান আল্লাহর প্রকৃত মা'রিফাত আমরা লাভ করেছি, তিনি যেভাবে তাঁর কিতাবে তাঁর নিজের বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবে তাঁর সকল বিশেষণ সহকারে। ... মুমিনগণ সকলেই সমান মারিফাতের বিষয়ে, এবং ইয়াকীন, তাওয়াক্কুল, মাহাববাত, রিযা (সন্তুষ্টি), খাওফ (ভয়), রাজা (আশা) এবং এ সকল বিষয়ের ঈমান-এর ক্ষেত্রে। তাদের মর্যাদার কমবেশি হয় মূল ঈমান বা বিশ্বাসের অতিরিক্ত যা কিছু আছে তার সবকিছুতে।"

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর বক্তব্য থেকে দুটি বিষয় সুস্পষ্ট: (১) মারিফাত ঈমানেরই সহযাত্রী। আল্লাহর সত্যিকার মারিফাত লাভই ঈমানের পথে পরিচালিত করে; এজন্য সকল মুমিনই আল্লাহর হক্ক বা প্রকৃত মারিফাত লাভ করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁরা

সকলেই সমমর্যাদার। (২) আল্লাহর মারিফাত গোপন কোনো তত্ত্বজ্ঞান নয় বা তা অর্জনের জন্য গোপন কোনো পথ নেই। মহান আল্লাহ তাঁর নিজের বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে যা জানিয়েছেন তা অবগত হওয়াই তাঁর প্রকৃত ও পরিপূর্ণ মারিফাত।

ইসলাম কি শুধু ধর্ম নাকি দ্বীন?

ইসলাম (আরবি: الإسلام) শব্দটি এসেছে আরবি س-ل-م থেকে যার তিনটি অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা,আত্মসমর্পণ করা।

ইসলাম হলো শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে

এক ও অদ্বিতীয় মহাপ্রতিপালক (আল্লাহ)

-এর সমীপে সার্বিক দিক থেকে আত্মসমর্পণ করা।

ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম। ইসলাম শুধুমাত্র মক্কা- মদিনা বা আরব দেশ ও জাতির জন্য নয় বরং ইসলাম বিশ্বের সকল বর্ণ, গোত্র, জাতি এবং ধনী-গরিব, সাদা-কালো ও আরব- অনারব সকল মানুষের জন্যই প্রেরিত ও একমাত্র মনোনিত ধর্ম।

ধর্ম", বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। সাধারণের বুঝ অনুযায়ী, ধর্ম হচ্ছে সৃষ্টিকর্তাকে খুশি করার জন্য পালনীয় কিছু আচার অনুষ্ঠান। এই সুবাদে হিন্দু মতবাদ একটি ধর্ম, খৃষ্টান মতবাদ একটি ধর্ম, শিখ/বৌদ্ধ/জৈন/ইহুদী/নাস্তিক এমনকি ইসলামও একটি ধর্ম। অন্যান্য মতবাদকে ধর্ম বলে গ্রহণ করা হলেও ইসলামকে কিছু অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম মনে করা যথার্থ হবে না। কারণ ইসলাম কথা বলে একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবন হতে শুরু করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত । সহজ কথায় বলা যায়, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয় ইসলাম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং ইসলামে আছে সুনির্দিষ্ট বিধি ব্যবস্থা। পবিত্র কুরআনে ইসলামকে বলা হয়েছে "দ্বীন"।

তাই ইসলামকে ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অনেক সময় মনে হতে পারে যে, এটাও পৃথিবীতে বিদ্যমান অন্যান্য ধর্মের মতো শুধুই একটি ধর্ম মাত্র। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক মুসলিমও মনে করে থাকেন যে, প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের মত ইসলামও

শুধুই একটি ধর্ম। বস্তুতঃ ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী জীবন বিধানের ব্যাপারে এই ধরণের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষ ধরে নেয় যে, ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম; যেখানে প্রচলিত অন্যবিধ ধর্মসমূহের ব্যাপ্তি সীমিত। তাছাড়া, অনেক মুসলিম একথাও মনে করে থাকেন যে, পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল ধর্মই গ্রহনযোগ্য এবং অন্যান্য ধর্ম ও মতাবম্বীগণের ইসলাম গ্রহণ না করা সেইসব লোকদের জন্য ক্ষতিকর কিংবা ভুল কোনো সিদ্ধান্তও নয়। কিন্তু পবিত্র কুরআনুল হাকিমের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে স্পষ্টভাবে এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাআ'লার নিকট গ্রহনযোগ্য দ্বীন হিসেবে একমাত্র ইসলামকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তাই কুরআনে বলা হয়েছ -

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯)

অপর এক সূরায় বলা হয়েছে -

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن
مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين

ইসলাম ছাড়া কেউ অন্য কোন ধর্ম অনুসরণ করলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ৮৫)

তাছাড়া, ইসলামকে শুধুই একটি ধর্ম বলা ভুল। বাস্তবিকপক্ষে এটি একটি ‘দ্বীন’, যার অর্থ- 'পরিপূর্ণ জীবন বিধান'। ধর্ম মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয়; পক্ষান্তরে ‘দ্বীন’ এর ব্যাপ্তি ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে। অন্যভাবে বলা যায়, দ্বীন মানব জীবনের সমস্ত বিষয়সমূহকে তার বেষ্টনীর মধ্যে আয়ত্ত্বাধীন করে

নেয় যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ। দ্বীন মানুষের জীবনের বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক দিক নিয়ে আলোকপাত করে এবং আমাদের চিন্তা ও কর্ম যেন মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার নির্দেশনার আলোকে সম্পাদিত হয়, তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয় - সেসব বিষয়ের উপরেও একইভাবে গুরুত্বারোপ করে। এ কারণে কুরআনুল কারিমের আলোকে ইসলাম সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা অত্যাধিক প্রয়োজন যার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন বিধান এবং শুধুই নিছক কোনো ধর্মের নাম নয়। এই ব্যাপারে কুরআনে অনেক জায়গায় অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ
وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ

“তিনি তাোমাদের জন্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; (তা হচ্ছে ঐ জীবন ব্যবস্থা) যার ব্যাপারে তিনি নূহ (আ:) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর আমি (আল্লাহ) তাোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তাোমরা দ্বীন কায়েম করাো এবং এই ব্যাপারে (দ্বীন কায়েম করতে গিয়ে) একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়াো না।”

পবিত্র কুরআনে ইসলামকে একটি প্রকৃত/ সত্যিকারের জীবন বিধান (দ্বীনুল হক্ক) বলা হয়েছে। ধর্মের বিপরীতে দ্বীন শব্দটির সংজ্ঞা কিংবা ব্যাখ্যা হল- ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। কারণ, ধর্ম শব্দটা সাধারণত সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর কারণ হচ্ছে, এটার আওতা কিছু ধর্মীয় আচার, অনুশাসন এবং সর্বোপরি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি পালনের সামাজিক প্রথার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ৬

পক্ষান্তরে, ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সকল প্রয়োজন ও সমস্যায় যেখানে পাওয়া যায় সঠিক সমাধান সেটাকে বলা যায় 'দ্বীন' বা 'জীবন বিধান'। ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান, জীবনের সামগ্রিক প্রয়োজন ও চাহিদাসমূহের সার্বিক সমাধান যে ইসলাম ধর্মে অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হয়েছে - অমোঘ এই ঘোষনাটি প্রদান করেছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা। ইরশাদ হচ্ছে-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপরে আমার নিআমতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। -(সুরা মায়িদাহ, আয়াত ৩ এর অংশ)

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস

ইসলামের আক্বীদা বা ঈমানই ইসলামকে অন্যান্য ধর্ম থেকে পৃথক করে।
আক্বীদা (العقيدة) অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস, যা ধারণ করে মানুষের জীবন পরিচালিত হয়। আদম-সন্তানহিসাবে দুনিয়ার সকল মানুষ সমান। কিন্তু আক্বীদা ও বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে তাদের কেউ মুমিন, কেউ কাফির। যারা মুমিন তারা আল্লাহকে তাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে দৃঢ় বিশ।বাস পোষণ করেন এবং তাঁর প্রেরিত বিধান সমূহ মেনে চলেন। পক্ষান্তরে যারা কাফির, তারা আল্লাহ ও তাঁর বিধানসমূহ অমান্য করে ও নিজেদের খেয়াল-খুশীমত চলে।

একজন মানুষকে মুসলমান হতে গেলে প্রথমে তাকে দু'টি বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হয়। যাকে কালেমায়ে শাহাদাত বলা হয়। اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَسُوْلُه. **'আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু'।**

অনুবাদ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

আক্বীদার অন্যতম বিশ্বাসগুলি হলো তওহীদ, ফেরেশতা, কিতাব, নবী-রাসূল, আখিরাত, ত্বকদীর -এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

"**তওহীদ**" -

তাওহীদ (আরবি: توحيد) ইসলাম ধর্মে এক ঈশ্বরের ধারণাকে বোঝায়। তাওহীদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। ইসলামী পরিভাষায় তাওহীদ হল সৃষ্টি ও পরিচালনায় আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করা, সকল ইবাদাত-উপাসনা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য করা, অন্য সবকিছুর উপাসনা ত্যাগ করা, আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলীকে তার জন্য সাব্যস্ত করা এবং দোষ ত্রুটি থেকে আল্লাহকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করা।

কুরআনে বলা হয়েছে,

"..কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।"[কুরআন 42:11]

কুরআনের অন্যস্থানে বলা হয়েছে,

"বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই।"[কুরআন 112]

"ফেরেশতা" -

ফিরিশতা বা ফেরেশতা(আরবি: ملاءكة)(ইংরেজি: Angels) ইসলামী বিশ্বাসমতে স্বর্গীয় দূত। আরবিতে ফেরেশতাদের একবচনে মালকা ও বহুবচনে মালাইকা বলে। এদেরকে আল্লাহ নূর বা আলো দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতারা সর্বদা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তারা আল্লাহর অবাধ্য হয় না। তারা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে না। তাছাড়াও বৈবাহিক,জৈবিক চাহিদা থেকে তারা পুরোপুরি মুক্ত। তারা নারী বা পুরুষ কোনোটিই নন।তারা পবিত্র স্থানে অবস্থান করে। তারা আল্লাহর হুকুমে যেকোনো স্থানে গমনাগমন ও আকৃতি পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখেন ।

ফেরেশতাদের সংখ্যা অগণিত।এদেরকে কিছু শ্রণিতে ভাগ করা যায়। যেমন :-

১.হামালাতুল আরশ: এরা হলো আল্লাহর আরশের বাহক।

২.জিব্রাইল: এই ফেরেশতার নাম তিনবার ইসলাম ধর্মের ধর্মগ্রন্থ কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে তাকে পবিত্র আত্মা বা রুহুল কুদুস বলা হয়েছে। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ এবং সংবাদ আদান-প্রদান যেসব ফেরেশতার দায়িত্ব, জিব্রাইল তাদের প্রধান। বলা হয়, জিব্রাইল-ই আল্লাহর নবীদের বা বাণীবাহকদের কাছে ওহী পৌছিয়ে দিতেন।

৩.মিকাইল: কুরআনে এই ফেরেশতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি বৃষ্টি ও খাদ্য উৎপাদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

৪.ইসরাফিল: এই ফেরেস্তা কিয়ামত বা মহাপ্রলয় ঘোষণা করবেন। তার নাম কুরআন শরীফে নেই কিন্তু হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.আজরাইল: তাকে কুরআনে মালাক আল-মাউত নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইনি মৃত্যুর ফেরেশতা ও প্রাণ হরণ করেন।

৬.সাতটি বেহেশতের ফেরেশতাগণ।

৭.হাফাজা বা তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাগণ।

৮.মুনকার ও নাকীর: কবরে প্রশ্নকারী ফেরেশতাদ্বয়।

৯.দারদায়িল

১০.মালিক: জাহান্নাম বা নরক তত্ত্বাবধানকারী ফেরেশতা।

১১.রেদওয়ান: জান্নাত বা স্বর্গ তত্ত্বাবধানকারী ফেরেশতা।

১২.জাবানিয়া: জাহান্নামে দায়িত্ব পালনকারী ফেরেশতাগণ।

১৩.নিয়ম শৃঙ্খলা পালনকারী ফেরেশতাগণ ইত্যাদি।

এছাড়াও বিশেষ দুজন ফেরেশতা কিরামুন ও কাতিবীন প্রতিজন মানুষের ভালো-মন্দ কাজের হিসাব রাখেন।

- জিবরাইল ও মিকাইলের নাম আল কুরআনের সুরা বাকারার ৯৭-৯৮ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।
- মালিক ফেরেশতার নাম ৪৩ নং সূরা আয-যুখরফে ৭৭ নং আয়াতে উল্লেখ আছে।

ফেরেশতাদের অস্তিত্ব বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম স্তম্ভ। আল্লাহ ইরশাদ, **‘...কেউ আল্লাহ, তার ফেরেশতা, তার কিতাবসমূহ, তার রাসুলগণ ও পরকালে বিশ্বাস না করলে সে তো মারাত্মকভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। ’ (সুরা নিসা, আয়াত : ১৩৬)**

ফেরেশতাদের সম্মানের কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, **‘মহান, পূত-পবিত্র লিপিকরের (ফেরেশতার) হাতে লিপিবদ্ধ। ’ (সুরা আবাসা, আয়াত : ১৫-১৬)**

ফেরেশতা সৃষ্টির ব্যাপারে হাদিস শরিফে এসেছে, **‘ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, আল্লাহর নুর বা ঐশী আলো থেকে। ’ (মুসলিম শরিফ, হাদিস নং : ২৯৯৬)**

"**কিতাব**" -

আসমানী কিতাব বা ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলতে এমন কতকগুলো গ্রন্থকে বোঝানো হয়, ইসলাম ধর্মমতে মুসলমানগণ যে গ্রন্থগুলোকে ঈশ্বরপ্রদত্ত গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করেন।

মুসলিম বিশ্বাস মতে, আসমানি কিতাবের সংখ্যা ১০৪ খানা। যা বিভিন্ন সময় আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী বা সংবাদ বাহকের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করা হয়।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, **'জেনে রাখো যে, আল্লাহর জ্ঞান অনুসারেই তা (কুরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) হবে কী?' (সূরা হূদ- ১১/১৪)**

আল্লাহ তাআলা অন্যত্রে বলেন, **'পরম করুণাময়, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করার ভাষা।' (সূরা আর রহমান- ৫৫/১-৪)**

আনাস ইবনু মালিক রাঃ বলেন, **রাসূল (সা.) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম (নর-নারীর) উপর ফরজ। (ইবনে মাজাহ্, হাঃ ২২৪, মিশকাত, হাঃ ২১৮)**

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, **'তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদের শিক্ষাদেন কিতাব (কুরআন) ও হিকমাহ (সুন্নাহ)।' (সূরা জুমুআহ- ৬২/২)**

আল্লাহ তাআলা অন্যত্রে বলেন, **আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব (কুরআন) ও হিকমাহ (সুন্নাহ) শিক্ষা দেয় আর তোমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না। (সূরা বাকারা-২/১৫১)**

"পয়গম্বর বা নবী" -

ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতির জন্য একজন বা একাধিক মানুষকে নবী বা রাসূল (বার্তাবাহক) পাঠিয়েছেন। তারা মানুষকে সৎ ও ন্যায়ের দিকে আহ্বান করেন এবং মানুষকে তার কর্মফলের ভিত্তিতে পরকালে পুরষ্কারের সুসংবাদ দেন ও শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেন।

আমি তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। (আল কোরআন - ২:২৫৬)

নবী রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে।

(ক) মানুষকে কুরআনের আয়াত পাঠ করে শোনানো। **(খ)** উম্মতকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা। অর্থাৎ কুফর, শিরক ও জুলুম পবিত্র করা। **(গ)** কিতাব ও হিকমা শিক্ষা দেওয়া। এখানে কিতাব বলতে পবিত্র কুরআন এবং হিকমা বলতে রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত উক্তিগত ও কর্মগত শিক্ষাসমূহ বুঝানো হয়েছে।

"আখিরাত বা পরকাল" -

মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে আখিরাত তথা পরকালের প্রতি বিশ্বাস। আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাসই মানুষকে সৎকর্মে অনুপ্রেরণা জোগায় এবং যাবতায় মন্দ কর্ম হতে নিভৃত রাখে। আখিরাতে বিশ্বাস মানে হলো মৃত্যুর পর পুনরায় অনন্ত জীবন লাভ করা। এই জীবনের সকল কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও

যথাযথ ভালো বা মন্দ ফল প্রাপ্তি এবং পরিণাম হিসেবে জান্নাত ও জাহান্নাম ভোগ করা। বিশ্বাসীদের পঞ্চ বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হলো আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস।

মানবজীবন পরিক্রমা চারটি জগতে পরিব্যাপ্ত। যথা: আলমে আরওয়াহ, আলমে দুনিয়া, আলমে বারজাখ ও আলমে আখিরাত। মানুষ হলো রুহ, নফস ও দেহের সম্মিলিত রূপ। আলমে আরওয়াহ বা রুহের জগতে শুধু রুহ ছিল, সঙ্গে ছিল নফস। এটি মানবজীবন চক্রের প্রথম জগৎ। আলমে দুনিয়া বা দুনিয়ার জগতে রুহ ও নফসের সঙ্গে দেহ বা শরীর যোগ হয়েছে, মৃত্যুর মাধ্যমে এই জগতের পরিসমাপ্তি হবে। এটি মানবজীবন চক্রের দ্বিতীয় জগৎ।

মৃত্যুর মাধ্যমে রুহ ও নফস দেহ ছেড়ে আলমে বারজাখে পাড়ি দেয়। এটি হলো ব্যক্তির কিয়ামত বা ব্যক্তির জাগতিক জীবনের পরিসমাপ্তি।

হাদিস শরিফে রয়েছে, ‘যখন কারও মৃত্যু হয়, তখন তার কিয়ামত সংঘটিত হয়।’ আলমে বারজাখ বা বারজাখ জগতে (মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত তথা হাশর-নশরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে) রুহ ও নফস ইল্লিন বা ছিজ্জিনে অবস্থান করবে এবং দেহ হয়তো বিলীন হয়ে যাবে, নয়তো সুরক্ষিত থাকবে। দ্বিতীয় কিয়ামত তথা শিঙায় প্রথম ফুৎকারে বড় কিয়ামত তথা সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রলয় বা ধ্বংস সংঘটিত হবে।

কোরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন, **‘এ জগতে যা কিছু আছে সবই লয়প্রাপ্ত হবে, শুধু আপনার রবের অস্তিত্বই টিকে থাকবে।’ (সুরা-৫৫ আর রহমান, আয়াত: ২৬-২৭)।** মৃত্যু বা প্রথম কিয়ামতের পর থেকে এবং দ্বিতীয় কিয়ামত বা শিঙায় প্রথম ফুৎকারের পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত আলমে বারজাখ বা বারজাখ জীবন। এটি মানবজীবন চক্রের তৃতীয় জগৎ। তৃতীয় কিয়ামত, অর্থাৎ শিঙায় দ্বিতীয় ফুৎকারের পর হাশর ও নশর তথা পুনরুত্থান ও মহামিলন বা মহাসম্মিলন অনুষ্ঠিত হবে। এটিই চূড়ান্ত

কিয়ামত। এই দিনই বিচারের দিন এবং আখিরাত বা পরকালের অনন্ত জীবনের সূচনা এদিন থেকেই হবে, যে জীবনের আর কোনো শেষ নেই, নেই কোনো সীমা। এটি মানবজীবন চক্রের চতুর্থ বা শেষ জগৎ। এই জগতের কোনো পরিসমাপ্তি নেই।

আখের অর্থ শেষ বা চূড়ান্ত। আখিরাত মানে পরকাল বা ভবিষ্যৎকাল ও অনাগতকাল। আখিরাত বা পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাস মানবজীবনাচার সুসংযত ও সুসংহত করে। কারণ, এর সঙ্গে বিচার ও কর্মফল জড়িত। জান্নাত-জাহান্নাম এরই সঙ্গে সম্পর্কিত। বলতে গেলে পরকালে বিশ্বাসই ইমানের তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। হাদিস শরিফে রয়েছে, 'ইমান আশা ও ভয়ের মধ্যে অবস্থান করে।' আর আশা ও ভয় হলো পরকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়।

আশা মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে, ভয় মানুষকে অন্যায় কর্ম থেকে বিরত রাখে। আশা না থাকলে ইহকালীন ও পরকালীন কোনো উন্নতিই সম্ভবপর নয়; ভয় না থাকলে সংযম ও সংযত আচরণ অসম্ভব প্রায়। আখিরাত সম্পর্কে কোরআনে বহু আয়াত রয়েছে। যেমন: **'আর অবশ্যই আপনার জন্য প্রথম জগৎ দুনিয়া অপেক্ষা আখিরাতই উত্তম বা শ্রেয়। অচিরেই আপনার রব আপনাকে দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।' (সুরা-৯৩, ওয়াদ-দুহা, আয়াত: ৪-৫)।**

মোমিন হলো দুনিয়াতে পরবাসী। আখিরাত বা পরকাল হলো মোমিন বা বিশ্বাসীদের আপন বাড়ি। আল্লাহ তাআলা আদি পিতা-মাতা হজরত আদম ও হজরত হাওয়াকে সৃষ্টি করে জান্নাতেই রেখেছিলেন। কুদরতের হেকমতে বা কৌশলগত কারণে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। আর বলে দিয়েছেন, তোমরা আমার হিদায়াত ও পথনির্দেশ অনুসরণ করলে আবার এখানেই ফিরে আসবে। আল্লাহ তাআলা মহানবী হজরত মুহাম্মাদকে মিরাজ রজনীতে এই জান্নাত দেখিয়ে এনেছেন, যাতে তিনি উম্মতকে এ বিষয়ে জানাতে পারেন। জান্নাত বা পরকালের আটটি বাড়ি হচ্ছে জান্নাতুল ফিরদাউস, জান্নাতুল মাওয়া,

জান্নাতুল আদন, দারুণ নাঈম, দারুস সালাম, দারুল কারার, দারুল মাকাম বা দারুল মুকাম,

দুনিয়ায় মানুষ হলো প্রবাসী বা পরবাসী। প্রবাসকালীন জীবনে প্রবাসী সব সময় আপন বাড়ির স্মরণ করে। এই স্মরণই তাকে উপার্জনে ও সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে; কষ্টসহিষ্ণু, সংযমী ও আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। এভাবেই প্রবাসজীবন শেষে একটি স্থিতিশীল, সুখী, সমৃদ্ধিশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনে সক্ষমতা লাভ করে।

পরকালীন নিবাস সম্পর্কে কোরআন কারিমে বহু আয়াত রয়েছে। যেমন: **'হে রাসুল (সা.), আপনি বলুন! হে আমার জাতি, তোমরা তোমাদের অবস্থান থেকে সামর্থ্যমতো সৎকর্ম করো, আমিও করছি; অচিরেই তোমরা জানতে পারবে পরিণতির শুভ নিবাস কাদের জন্য।' (সুরা-৬ আনআম, আয়াত: ১৩৫)। 'তোমাদের প্রতি শান্তি! যেহেতু তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ, পরিণতি জান্নাতের বাড়ি কত না উত্তম। (সুরা-১৩ রাআদ, আয়াত: ২৪)। 'যারা সৎকর্ম করবে, তারা দুনিয়াতেও কল্যাণ লাভ করবে, পরকালের নিবাস অতি উত্তম; মুত্তাকিদের নিবাস কত না উত্তম।' (সুরা-১৬ নাহল, আয়াত: ৩০)। 'নিশ্চয়ই পরকালের নিবাস চিরস্থায়ী, যদি তারা জানত।' (সুরা-২৯ আনকাবুত, আয়াত: ৬৪)। 'নিশ্চয়ই আখিরাত হলো স্থিতিশীল স্থায়ী নিবাস।' (সুরা-৪০ মোমিন, আয়াত: ৩৯)।**

"ত্বকদীর" -

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের সর্বশেষ তাকদীর তথা ভালো-মন্দ নির্ধারণে বিশ্বাস। তাকদীরের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, এই বিশ্বাস করতে হবে যে, সবকিছুকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, সেগুলি সৃষ্টি হওয়ার আগেই তিনি সে সম্পর্কে জানেন, তিনি তা

লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন এবং সবকিছু তার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে,

"তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তা জানেন? নিশ্চয় তা একটি কিতাবে রয়েছে। অবশ্যই এটা আল্লাহর জন্য অতি সহজ।"—কুরআন ২২:৭০

অপর এক আয়াতে বলেন -

"আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন।"—কুরআন ৮১:২৯

হাদীসে বলা হয়েছে,

"...যদি সমগ্র উম্মত তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (তাকদীরে) লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (তাকদীরে) লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (তাকদীরের লিপি) শুকিয়ে গেছে।"
—তিরমিযী ২৫১৬ (হাসান সহীহ)[২]
শর্ত

অর্থ্যাৎ,এগুলো সব হলো ইসলামের মোলিক বিশ্বাস। আর এগুলো অবিশ্বাস করা মানে একজন মুসলিমের ঈমান চলে যাওয়া।
আর এই ঈমান ভঙ্গের ও কিছু কারণ আছে, যেমন :-

ওযু করার পর কিছু কাজ করলে যেমন ওযু নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ঈমান আনার পর কিছু কথা, কাজ ও বিশ্বাস আছে, যা সম্পাদন করলে বা পোষণ করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো মূলত ৩ প্রকার। বিশ্বাসগত, কর্মগত এবং উক্তিগত। যেমন -

এক. আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা

'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে অংশীদার করা ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে সে এক মহাপাপ করে।' [সুরা নিসা ৪ : ৪৮]

'কেউ আল্লাহর সঙ্গে শিরক করলে অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। আর জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।' [সুরা মায়িদা, ৫ : ৭২]

দুই. আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে কাউকে মধ্যস্থতাকারী বানানো

'তারা আল্লাহকে ব্যতীত যার ইবাদাত করে তা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। বল, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র এবং তারা যাকে শরিক করে তা হতে তিনি ঊর্ধ্বে।' [সুরা ইউনুস, ১০ : ১৮]

'জেনে রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরুপে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে, ইহারা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে।' তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে

মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফয়সালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।' [সুরা যুমার, ৩৯ : ৩]

তিন. মুশরিক-কাফিরদের কাফির মনে না করা।

এমন কাফির, যার কুফুরির ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ একমত। সেটা আসলি কাফির হতে পারে—যেমন ইহুদি, খৃস্টান ও হিন্দু সম্প্রদায়—আবার মুরতাদ, যিনদিকও হতে পারে, যেমন প্রকাশ্যে আল্লাহ, রাসুল বা দীনের কোনো অকাট্য ব্যাপার নিয়ে কটূক্তিকারী; যাদের কুফরির ব্যাপারে হকপন্থি আলিমগণ একমত।

চার. নবির ফয়সালার তুলনায় অন্য কারও ফয়সালাকে উত্তম মনে করা

'আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবর্তীণ হয়েছে, আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি। তারা বিচার-ফয়সালা নিয়ে যেতে চায় তাগুতের কাছে, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা তাকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদের প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।' [সুরা নিসা, ৪ : ৬০]

পাঁচ. মুহাম্মাদ আনীত কোনো বিধানকে অপছন্দ করা

'অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক বলে মনে না করে। এরপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।' [সুরা নিসা, ৪ : ৬৫]

ছয়. দীনের কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা

“তুমি তাদের প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, ‘আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম।’ বলো, ‘তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসুলকে বিদ্রুপ করছিলে?’ তোমরা অযুহাত দেয়ার চেষ্টা করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরি করেছ।” [সুরা তাওবা, ৯ : ৬৫-৬৬]

সাত. জাদু করা

‘সুলাইমান কুফরি করেনি, কুফরি তো করেছিল শয়তানরাই। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত...।’ [সুরা বাকারা, ২ : ১০২]

আট. মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা

‘হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাইও যদি ঈমানের বিপরীতে কুফরিকে বেছে নেয়, তবে তাদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।’ [সুরা তাওবা, ৯ : ২৩]

‘হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খৃস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।’ [সুরা মায়িদা, ৫ : ৫১]

নয়. কাউকে দীন-শরিয়তের ঊর্ধ্বে মনে করা

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।' [সুরা মায়িদা, ৫ : ৩]

দশ: দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া

'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি দ্বারা উপদিষ্ট হয়েও তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অপেক্ষা অধিক অপরাধী আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।' [সুরা সাজদা, ৩২ : ২২]

অর্থ্যাৎ,একজন সত্যিকারের মুসলিমের জন্য ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তার জন্য। কারণ এগুলোর বিশ্বাসে কোনো কিছুর বিঘ্ন ঘাটলে তার আক্বিদার উপর প্রভাব পড়বে। তাই এগুলোর উপর মন থেকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

ইসলামের নীতি

ইসলামে নীতি (خلاق إسلامية), "ভাল চরিত্র" হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয়ে ঐতিহাসিকভাবে ৭ম শতাব্দী থেকে ধীরে ধীরে রূপ নিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত একাদশ শতাব্দীতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।শেষ পর্যন্ত এটিকে কুরআন শিক্ষার সফল সংমিশ্রণ, নবী মুহাম্মাদ (স.) -এর শিক্ষা, ইসলামী ফকীহগণের পূর্বসূরী (শরিয়া ও ফিকাহ দেখুন), প্রাক-ইসলামিক আরবীয় ঐতিহ্য এবং আরবিহীন উপাদানসমূহ (পার্সিয়ান এবং গ্রীক ধারণা) এম্বেড করা হয় বা একটি সাধারণ ইসলামিক কাঠামোর সাথে সংহত করা হয়। যদিও মুহম্মদের প্রচার "নতুন ধর্ম এবং বর্তমান ধর্মের নিষেধাজ্ঞার ভিত্তিতে এবং আল্লাহ ও শেষ বিচারের ভয়" এর ভিত্তিতে নৈতিক মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিল,

আরবদের উপজাতির অভ্যাস পুরোপুরি মরে যায়নি। পরবর্তীকালে মুসলিম আলেমগণ কুরআন ও হাদিসের ধর্মীয় নৈতিকতা বিস্তৃতভাবে প্রসারিত করেছিলেন।

ইসলামী নীতিশাস্ত্রের ধীরে ধীরে কোডিংয়ের মূল উৎসটি ছিল মুসলমানদের বোঝার এবং কোরআনের ব্যাখ্যা এবং মুহাম্মদের আমল। এর অর্থ সর্বদা ঈশ্বরের কাছে সক্রিয় জমা দেওয়ার প্রসঙ্গে (আরবি: আল্লাহ), সম্প্রদায় দ্বারা একত্রিত হয়ে সম্পাদিত হয়েছিল। ইসলামী নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য শক্তি হল এই ধারণাটি যে প্রতিটি মানুষকে জীবনের সব ক্ষেত্রে "সৎকর্মের আদেশ দিতে এবং মন্দকে নিষেধ করতে বলা হয়। মুসলমানরা এই জমা দেওয়ার সুবিধার জন্য মুহাম্মদের ভূমিকার বিষয়টি বোঝে। ইসলামী নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রের আরেকটি মূল কারণ হল এই বিশ্বাস যে মানবজাতি ঈশ্বরের ইচ্ছা চিহ্নিত করার জন্য এবং এর দ্বারা অনুধাবন করার জন্য অনুষদকে দেওয়া হয়েছে। এই অনুষদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে অস্তিত্বের অর্থ প্রতিফলিত করে। সুতরাং, তাদের পরিবেশ নির্বিশেষে, মানুষের বিশ্বাস করা হয় যে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বশীভূত করার এবং ইসলামকে অনুসরণ করার নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে, যেমন কোরআনে প্রদর্শিত হয়েছে।

এই প্রাকৃতিক ঝোঁক, কুরআন অনুসারে, বস্তুগত সাফল্যের দিকে মানবজাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে: এই ধরনের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রথমে নিজেকে প্রাথমিক বেঁচে থাকার বা সুরক্ষার প্রয়োজন হিসাবে উপস্থাপন করে, তবে তারপরে তার সমবয়সীদের মধ্যে আলাদা হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশ পায়। পরিশেষে, ইসলামী গ্রন্থ অনুসারে বস্তুবাদ সম্পর্কে ফোকাস উপর্যুক্ত বর্ণিত সহজাত প্রতিচ্ছবিতে বাধা সৃষ্টি করে, যার ফলে অজ্ঞতা বা "গাফিলত" হয়। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে ইসলামের অন্যান্য ভাববাদীদের মতো মুহাম্মদও পাঠিয়েছিলেন ঈশ্বর মানবকে তাদের নৈতিক দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং সমাজে সেই ধারণাগুলি চ্যালেঞ্জ করার জন্য যা

ঈশ্বরের অনুগত হওয়ার বিরোধিতা করে। কেলসির মতে, এই চ্যালেঞ্জটি প্রাক-ইসলামী আরবের পাঁচটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল:

আরবদের বিভাজন বিভিন্ন উপজাতিতে (রক্ত ও আত্মীয়তার ভিত্তিতে)। এই শ্রেণিবদ্ধকরণটি ইসলামী ধর্মভিত্তিক, "উম্মাহ" এর ভিত্তিতে একীভূত সম্প্রদায়ের আদর্শের মুখোমুখি হয়েছিল; আল্লাহ ব্যতীত প্রচুর দেব-দেবীর উপাসনার গ্রহণযোগ্যতা - কঠোর ইসলামী একেশ্বরবাদ দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা এই মতামত, যে নির্দেশ দেয় যে আল্লাহর ইবাদতের কোন অংশীদার নেই বা কোন সমান নয়; মুরউওয়ার বৈশিষ্ট্য (পুরুষত্ব), যা ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছিল, পরিবর্তে নম্রতা ও তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলিকে জোর দিয়েছিল; খ্যাতি অর্জন বা একটি উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠায় ফোকাস, যা মানবজাতির পুনরুত্থানের দিন ঈশ্বরের সামনে হিসাবরক্ষণ করা হবে এমন ধারণা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল; পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মতি, এই চর্চাকে ইসলাম চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল - যা পরিবর্তে toশ্বরের নিকটে বশীভূত হওয়া এবং ওহীর অনুসরণকে প্রাধান্য দেয়। এই পরিবর্তনগুলি মুসলিম বিশ্বাস, বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধের শ্রেণিবিন্যাসের পরিচয় এবং জীবন সম্পর্কিত সমাজের পুনর্গঠনে অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী প্রজন্মের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি আরব উপদ্বীপে সমাজে ও জীবনের নৈতিক ব্যবস্থায় এক বিরাট রূপান্তর ঘটায়।

ফিতরাতের দ্বীন ইসলাম

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করাটা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এই সহজাত বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় ফিতরাত।এটি প্রত্যেক মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে সে আল্লাহর অস্তিত্বের বস্তবতা স্বীকার করে ও আল্লাহর নির্দেশ পালন করে।

যিনওি আমাদেরকে, চারপাশের এই পৃথিবীটাকে এবং পৃথিবীর ভিতরে যা কিছু আছে,সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন,এমন একজন সু্ৃমহান সত্তার অস্তিত্ব এর ব্যাপারে

অটল সাক্ষ্য দেবার সহজাত প্রবনতা এই ফিতরাত। এটা একটা উপহার, যা খোদাই করা মানুষের আত্মায় আত্মায়। ফলে যারা আল্লাহর হিদায়াত থেকে মুখ পিরিয়ে নেয়, তাদের মাঝে ও এই জন্মগত বৈশিষ্ট্যটা রয়েই যায়।
সূরাহ রুমে আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন -

তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি (ফিতরাত), যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' (সূরাহ রুম | আয়াত ৩০)

বিভিন্ন বাহ্যিক প্রভাবে মানুষ সহজাত ধর্ম (ফিতরাত) থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে। যেমন- পিতামাতার প্রভাব, সমাজের প্রভাব ইত্যাদি।

- **ফিতরাতের উপর পিতামাতার প্রভাবঃ**

প্রতিটি মানব সন্তানই ইসলামী ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, **'প্রতিটি নবজাতকই জন্মলাভ করে ফিতরাতের উপর। এরপর তা মা-বাপ তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু যখন একটি (পূর্ণাংগ) বাচ্চা জন্ম দেয় তখন কি তোমরা তার কানকাটা দেখতে পাও? এরপর আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিলাওয়াত করলেন- "আল্লাহর দেওয়া ফিতরাতের অনুসরণ কর, যে ফিতরাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এটাই সরল সুদৃঢ় দ্বীন' (সূরাহ রূম: ৩০)। (বুখারি, মুসলিম)**

- **পরিবেশের প্রভাবঃ**

এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (স.) হাদিসে জানিয়েছেন যে,পরিবেশের প্রভাব একজন ব্যাক্তিকে

সরল পথ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করতে পারে। এমনকও পথভ্রষ্ট বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের অনুসারী বানাতে পারে।

- **শয়তানের প্রভাবঃ**

শয়তানও মানুষকে সহজাত বৈশিষ্ট্য থেকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বিচ্যুত করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

'সাবধান, আমার প্রতিপালক আজ আমাকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, তা থেকে তোমাদেরকে এমন বিষয়ের শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যা সম্পর্কে তোমরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। তা হলো এই যে, (আল্লাহ বলেন), 'আমি আমার বান্দাদেরকে যে ধন-সম্পদ দেব তা পরিপূর্ণরূপে হালাল। আমি আমার সমস্ত বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ (মুসলিম) হিসাবে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন হতে বিচ্যুত করে দেয়। আমি যে সমস্ত জিনিস তাদের জন্য হালাল করেছিলাম সে তা হারাম করে দেয়। অধিকন্তু সে তাদেরকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শিরক করার জন্য নির্দেশ দিল, যে বিষয়ে আমি কোনো সনদ পাঠাইনি।' (সহীহ মুসলিম)

ফিতরাতের বাস্তবতার প্রমান হলো,যখন মানুষ বিভিন্ন উত্থানপতন এর কারণে দুর্দশাগ্রস্ত হয় এবং
কষ্টভোগ করে, তখন সহজাত ভাবেই আল্লাহর কাছে সাহায্যে চায়। এ বিষয়টি কুরআনের অনেক আয়াতে
উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়া, প্রত্যেকে নিজের জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা থেকেও এই বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারে।

আল্লাহ বলেছেন -

'মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকতে শুরু করে, এরপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত দান করি, তখন সে বলে, এটা তো আমি পূর্বের জানা মতেই প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না।' (সূরাহ যুমার, ৩৯:৪৯)

অন্যত্র বলেছেন -

'যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন তাকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্যে পূর্বে ডেকেছিল এবং আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে; যাতে করে অপরকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। বলুন, তুমি তোমার কুফর সহকারে কিছুকাল জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত।' (সূরাহ যুমার ৩৯:৮)

অন্য আয়াতে বলেন -

''আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে।' (সুরাহ ফুসসিলাত, ৪১:৫১)

অপর এক আয়াতে বলেছেন -

''আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, শুয়ে বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায় তখন মনে হয়।

কখনো কোন কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে মনঃপুত হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে।' (সূরাহ ইউনুস, ১০:১২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন -

তিনিই তোমাদের ভ্রমন করান স্থলে ও সাগরে। এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হল, নৌকাগুলোর উপর এল তীব্র বাতাস, আর সর্বদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারল যে, তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল আল্লাহকে তাঁর ইবাদাতে নিঃস্বার্থ হয়ে যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোল, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

তারপর যখন তাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়ে দিলেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অনাচার করতে লাগল অন্যায় ভাবে। হে মানুষ! শোন, তোমাদের অনাচার তোমাদেরই উপর পড়বে। পার্থিব জীবনের সুফল ভোগ করে নাও-অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি বাতলে দেব, যা কিছু তোমরা করতে।' (সূরাহ ইউনুস, ১০:২২-২৩)

দুঃখ -দুর্দশায় আক্রান্ত হওয়ার পিছনে বিভিন্ন হিকমত রয়েছে। মানুষের জীবনে নানা পরিস্থিতির কারণে বিশুদ্ধ ফিতরাতের উপর প্রলেপ জমতে থাকে। কষ্ট মুসিবতের দ্বারা দূরীভূত হয়ে যায় এই জমে থাকা কুফর ও বিভ্রন্তির আবরণ। কখনও কখনও এসবের গভীরে তলিয়ে যায় এই ফিতরাত।অথচও এই মানুষটিও যখন বিপদে,তখন এমন এক সত্তার কাছে আকুতি জানায়, যার সম্পর্কে সে মনেপ্রাণে জানে যে এই কঠিন বিপদে একমাত্র তিনিই সাহায্য করতে সক্ষম! বিপদে পড়লে সাহায্য কামনা মানুষের একটি স্বয়ংক্রিয় সহজাত বৈশিষ্ট্য। যদি আমরা কোনো বাস্তব ভিডিওচিত্রে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পতিত মানুষের অবস্থা দেখি,তাহলে সেখানে ও দেখা যায় অধিকাংশ

বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি (যদিওবা তারা অমুসলিম) "গড" এর কাছে সাহায্যে প্রার্থনা করছে কোনো না কোনোভাবে।

হে আল্লাহ তুমি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে তোমার অনুগত বান্দা তথা মুসলিম হিসেবে জীবন পরিচালনা এবং মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণের তৌফিক দাও। আমিন।

ইসলাম কেন একমাত্র গ্রহনযোগ্য ধর্ম

আল্লাহতায়ালা বলেন, **'নিশ্চয় আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম' (সূরা আলে-ইমরান-১৯)।**
যাদের প্রতি কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের কাছে প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও, মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে শুধু পরস্পর বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই। যারা আল্লাহর নিদর্শনগুলোর প্রতি কুফরি করে, তাদের জানা উচিত যে নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত। - (সূরা আলে ইমরান)

কোরআনের পরিভাষায় 'দ্বীন' সেসব মূলনীতি ও বিধিবিধানকে বলা হয় যা হজরত আদম থেকে শুরু করে হজরত মুহাম্মদ পর্যন্ত সব নবীর মধ্যে সমভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। এতে বোঝা যায়, সব নবীর দ্বীনই এক ও অভিন্ন ছিল। সাধারণত ওই দ্বীন ও শরিয়তকেই 'ইসলাম' বলা হয়, যা নিয়ে সবার শেষে হজরত মুহাম্মদ আগমন করেছেন এবং বিগত সব শরিয়তকে রহিত করে দিয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যে দ্বীন কায়েম থাকবে। তাই রসুল ইসলামের ব্যাখ্যায় বলেন, **এ কথার স্বীকৃতি দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, হজরত মুহাম্মদ আল্লাহতায়ালার রসুল, নামাজ কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, রমজান শরিফের রোজা রাখা, সম্পদ থাকলে হজ করা। এ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তিনি জিব্রাইলের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে (বুখারি ও মুসলিম)।** রসুল আরও বলেন, **এখন হজরত মূসা (আ.) জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তার**

গত্যন্তর ছিল না (বায়হাকি)। এ অর্থের দিক দিয়ে 'ইসলাম' শব্দটি দ্বীনে মুহাম্মদী ও উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার এক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। মোট কথা এই যে, প্রত্যেক পয়গাম্বরের আমলে তার আনীত দ্বীনই ছিল দ্বীনে ইসলাম এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। পরে এগুলো একের পর এক রহিত হয়েছে এবং দ্বীনে মুহাম্মদী 'ইসলাম' নামে অভিহিত হয়েছে। যা কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়, একমাত্র ইসলাম ছাড়া এই পৃথিবীতে তথাকথিত যত ধর্ম ও মতবাদ আছে কোনোটাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ভ্রান্ত ধর্ম অবলম্বন করে সফল হতে চায় তাদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন : **'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম সন্ধান করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত' (সূরা আলে ইমরান-৮৫)**।

ইসলামের পরিপূর্ণতা পবিত্র কোরআনে বারবার ঘোষিত হয়েছে। অতএব, যারা ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামকে মানতে রাজি অথচ সমাজ ও জাতীয় জীবনে ইসলামের প্রতিফলন দেখতে নারাজ তারা ইসলামের কিছু অংশের প্রতি বিশ্বাস করে আর কিছু অংশের প্রতি অবিশ্বাস করে, আল্লাহতায়ালার কাছে খণ্ডিত ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়। মহানবী ইরশাদ করেন, প্রতিটি মানুষের কবরে তিনটি প্রশ্ন করা হবে— ১. তোমার রব কে? ২. তোমার দ্বীন কী? ৩. এই ব্যক্তি কে? যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। যে ব্যক্তি জবাবে বলবে, আমার প্রভু আল্লাহ! আমার ধর্ম ইসলাম। তিনি হলেন মহানবী (সা.)! সে ব্যক্তিই সেদিন মুক্তি পাবে। আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো পথ অন্য কোনো মতাদর্শ গ্রহণ করেছিল তারা কবরে জবাব দিতে হবে।

ইসলামই সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম

আল্লাহতায়ালা মোমিনদের জন্য ইসলামকে দ্বীন ও জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। এটি মোমিনদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির প্রমাণ। আল্লাহতায়ালা বলেন, **'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই দ্বীনরূপে পছন্দ করলাম।' (সুরা মায়িদা : ৩)**।

অবতীর্ণ হওয়ার দিক দিয়ে এটি কোরআনের সর্বশেষ আয়াত। আল্লাহতায়ালা এখানে উত্তম পুরুষ কর্তা ব্যবহার করে কথা বলেছেন। তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন, উম্মতে মুহাম্মদির জন্য তিনি দ্বীনকে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তাদের প্রতি তাঁর নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছেন। তিনি ইসলামকে মোমিনদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা দ্বীনকে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তাঁর নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছেন। কাফেররা দ্বীনের ক্ষতি সাধন করা, তাতে বিকৃতি ঘটানো ও দ্বীনকে ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত করা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। আল্লাহতায়ালা এ দ্বীনের জন্য পরিপূর্ণতা নির্ধারণ করে রেখেছেন। এ দ্বীনের স্থায়িত্ব চূড়ান্ত করেছেন। তিনি নিজেই এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমিই এ কোরআন নাজিল করেছি এবং আমিই এর হেফাজত করব।' (সুরা হিজর : ৯)।

- ইসলাম পরিপূর্ণ ও ব্যাপক ধর্মঃ

আল্লাহতায়ালা বলেছেন, ইসলাম পরিপূর্ণ, ব্যাপক। এটি সর্বশেষ আসমানি বার্তা। এমন এক রাসুলের মাধ্যমে ইসলামকে জগৎবাসীর সামনে উপস্থাপন করেছেন, যাকে তিনি পবিত্র করেছেন, নির্বাচন করেছেন, নৈকট্যশীল বানিয়েছেন। তাকে প্রেরণ করেছেন মানব-দানব উভয় জাতির কাছে। প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, জগৎবাসীর জন্য রহমতরূপে। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আলোকজ্জ্বল প্রদীপ। তাকে

দান করেছেন এমন এক কিতাব, যা পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে সত্যায়নকারী। তিনি এমন প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছেন, যা মানুষের বুদ্ধি-বিবেককে স্পর্শ করেছে। তাতে জীবনের সব ক্ষেত্রের জন্য দিকনির্দেশনা রয়েছে। ব্যক্তিজীবন, পরিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনসহ সব অঙ্গনের জন্য রয়েছে সুবিন্যস্ত বিধিমালা। ইসলাম সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্ককে সুশৃঙ্খল করেছে। এক মুসলমানের অপর মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে, মুসলমানের অমুসলিমের সঙ্গে, এমনকি প্রাণিকুলসহ সবাক-নির্বাক পৃথিবীর তাবৎ বস্তুনিচয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে, তাও ইসলাম শিখিয়ে দিয়েছে। ইসলামে সব সমস্যার সমাধান রয়েছে। ছোট-বড় সব বিষয়ের বিধান রয়েছে। এমনকি মানুষ প্রকৃতির ডাকে কীভাবে সাড় দেবে, তাও ইসলাম শেখাতে বাদ দেয়নি।

- মুসলিম উম্মাহর কর্তব্যঃ

যিনি সর্বশেষ আসমানি বার্তা অবতীর্ণ করেছেন, যিনি তাকে পূর্ববর্তী সব ধর্মের জন্য রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন, তিনিই এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্বজগতে কী ঘটেছে, ভবিষ্যতে কী ঘটবে, পৃথিবীতে কী ধরনের পরিবর্তন আসবে, মানব জীবনের কী কী নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টি হবে, এর সবই তিনি জানেন। অতএব, আদল-ইনসাফ ও তাকওয়া-পরহেজগারির মূলনীতিকে সামনে রেখে তিনি সব সম্ভাবনাময় পরিস্থিতির বিধান পৃথিবীবাসীকে উপহার দিয়েছেন। ‘এ দ্বীন পরিপূর্ণ নয়, এতে কোনো ধরনের সংস্কার, সংযোজনের প্রয়োজন আছে’, কোনো মুসলমানেরই এমনটি মনে করার সুযোগ নেই। এটি একটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গি; ইসলামের প্রকৃত বাস্তবতার সঙ্গে পরিপূর্ণ বিরোধপূর্ণ। মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য হচ্ছে, এমন সুন্দর দ্বীনকে নেয়ামত হিসেবে যিনি দান করলেন, তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের চেষ্টা করা; নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করে রবের হক আদায়ে সচেষ্ট হওয়া। আল্লাহতায়ালা যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে নির্বাচন করলেন, এর যথাযথ মূল্যায়ন করা। তিনি যেই দ্বীনকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে

ধরতে হবে। এ দ্বীনের ওপর অটল ও অবিচল থাকার পেছনে সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয় করতে হবে।

- ইসলামই একমাত্র দ্বীনঃ

আল্লাহর কাছে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামের মাঝেই আল্লাহতায়ালা বান্দার পূর্ণ সৌভাগ্য নিহিত রেখেছেন। ঈমান-আকিদা ও বিধিবিধানসহ ইসলামের যাবতীয় বিধানকে তাই অবনত মস্তকে গ্রহণ করে নিতে হবে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীনের অনুসরণ সর্বত পরিতাজ্য। আল্লাহতায়ালা বলেন, **‘যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন অন্বেষণ করে, তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’ (সুরা আলে ইমরান : ৮৫)।**

আল্লাহর কাছে যে ইসলাম গ্রহনযোগ্য নয়

আল্লাহর কাছে যে ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়’- কথাটি শুনতেই যেন কেমন লাগে। ‘ইসলাম’ নামে এমন কোনো আলাদা জীবন ব্যবস্থা আছে কি? যা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ‘না’, এমন কোনো জীবন ব্যবস্থা নেই। তাহলে এমনটি বলার উদ্দেশ্য কী?

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন, ‘ইসলাম-ই আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা। আর তা তখনই মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত হয়, যখন মানুষ পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পিত করে।

বর্তমান সময়ে একদল লোক দেখা যায়, যারা ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝার চেষ্টা করে না। তারা ইসলামকে নিতান্তই ব্যক্তিগত বিষয় মনে করে। প্রকৃতার্থে ইসলাম এমন জীবন ব্যবস্থা নয়।

বরং ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। যেখানে কোনো বিষয়ের ঘাটতি নেই। যা মানুষকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অথনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জীবন পরিচালনায় তার বিধান বা জীবন ব্যবস্থা পেশ করে। ইসলাম এমনই এক জীবন বিধান, যা-> পূর্ণ পরিণত> যুক্তিসঙ্গত> বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় বার বার পরীক্ষিত জীবন বিধান।

মানব জীবনের এমন কোনো দিক বা বিষয় নেই, যা ইসলামের আওতাধীন নয়। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইসলাম মানুষের জীবনের সেই পরিপূর্ণতার কথা বার বার ঘোষণা করে।

এখন প্রশ্ন হলো, ‘আল্লাহর কাছে কোন ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়?’> যারা ব্যক্তি জীবনে ইসলামকে মানতে রাজি কিন্তু সমাজ ও জাতীয় জীবনে ইসলামের বিধান প্রতিফলন, বাস্তবায়ন দেখতে নারাজ।- যারা ইসলামের কিছু অংশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মেনে নেয় আর কিছু অংশের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং জীবনে বাস্তবায়ন কিংবা মেনে নিতে চায় না।

আল্লাহ তাআলার কাছে এ রকম খণ্ডিত ইসলাম কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামের কিছু বিধান খুব মন দিয়ে মেনে নেবে আর কিছু অংশ ছেড়ে দেবে। এ ধরনের ইসলাম পালন কোনোভাবেই আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য নয়।

বরং যদি কেউ ইসলামের কোনো বিষয়ে আপত্তি করে কিংবা মেনে নিতে না পারে; সে ব্যক্তির ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারেই প্রশ্ন এসে যায়।

সুতরাং সাবধান!বর্তমান সময়ে আধুনিকতার নামে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে কোনো মুসলমানের সেকুলারিজম তথা ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস স্থাপনের কোনো সুযোগ নেই।

মনে রাখতে হবে ইসলাম গ্রহণকারী মুসলিম আল্লাহর বিধানের বাইরে অন্য কারো কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। ইসলামকে একমাত্র জীবন বিধান ঘোষণার পর আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে ঘোষণা করেন-‘
তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সবই আল্লাহর অনুগত হয়েছে আর তার দিকেই ফিরে যেতে হবে।’ (সুরা আল-ইমরান : আয়াত ৮৩)

সুতরাং পরিপূর্ণ, যুক্তিসম্মত ও বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় প্রমাণিত ইসলামের প্রতি নিজেদের নিয়োজিত রাখতে কুরআনের এ নির্দেশ মতো জীবন গঠন করা মুসলিম উম্মাহর জন্য একান্ত আবশ্যক। আর তাহলো-**‘রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো আর যে কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাক।’ (সুরা হাশর : আয়াত ৭)**

তাই ইসলামের একান্ত দাবি হলো- মানুষের ব্যক্তি, পরিবার সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করবে। কেননা জীবন পরিচালনায় ইসলামের বাইরে কোনো কাজই আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। ইসলাম বহির্ভূত যে কোনো কাজ বা বিষয়কে পরিহার করার তাওফিক দান করুন।

উপসংহার

সৃষ্টির শুরু লগ্ন থেকে মানুষ জাতির হেদায়াতের জন্য মহান রাব্বুল 'আলামীন পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেছেন অসংখ্য নবী-রাসূল (''আলাইহিমুস সালাম)। নাযিল করেছেন বহু আসমনী কিতাব ও সহীফা। তাঁরা যুগে যুগে তাওহীদের বাণী প্রচার করে গেছেন মানুষের দ্বারে দ্বারে। নবীর অবর্তমানে মানুষ যে বাতিল ও মিথ্যাকে সত্য মনে করে গ্রহণ করেছিল নবীগণ এসে মানুষের সামনে সে বাতিল ও মিথ্যার অসারতা বর্ণনা করেছেন এবং সত্যের পরিচয় তুলে ধরেছেন। বহু ঈশ্বরের বাণীর পরিবর্তে মহান আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের বাণী শুনিয়েছেন।

সর্বশেষ আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাইয়িদুল মুরসালিন, খাতামুন্নাবিয়্যিন হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত মানব ও জিন জাতির হেদায়াতের জন্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। সেই সাথে তার উপর নাযিল করেছেন সর্বশেষ মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে কারীম। অতএব কুরআন নাযিল হওয়ার পর যেমন অপরাপর সকল ধর্মের কিতাব রহিত হয়ে যায়। তেমনি শেষ নবীর আবির্ভাবের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল নবীর আনীত ধর্মও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এবং মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে ইসলাম ধর্মকেই মনোনীত করা হয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, ُإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَام

অর্থ: 'আল্লাহর নিকট মনোনিত ধর্ম একমাত্র ইসলাম'। (সূরা আলে ইমরান: ১৯)

উক্ত আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে কাসীর রহ. লেখেন, এই আয়াত দ্বারা এই সংবাদ দেয়া উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দীন কেবল ইসলাম। আর সর্বযুগে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবীদের ওহীর অনুসরণ করার নাম ইসলাম। সর্বশেষ এবং সকল নবীর সমাপ্তকারী হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার নবুয়তের পর পূর্বের সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। এখন যে কেউ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পর তার শরী'আত ব্যতীত অন্য কোন শরী'আত গ্রহণ করে মৃত্যু বরণ করবে তা আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অপর আয়াতে বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

যে ব্যক্তি ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম তালাশ করবে কখনো তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আলে ইমরান: ৮)